প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাটকের অভিব্যক্তির ধারা

ক. রুদ্রচন্ড

রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'রুদ্রচন্ড'-এর রচনা কাল নিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মন্তব্য আমরা দেখতে পাই। রবীন্দ্র রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খন্ডে(বিশ্বভারতী) গ্রন্থ পরিচয় অংশে উল্লেখ করা হয়েছে " 'রুদ্রচন্ড' কবির প্রথম নাটক (গীতিনাট্য নহে)। ইহা ১৮০৩ শকে (২৫ জুন ১৮৮১) প্রকাশিত হয়।" বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগে 'রুদ্রচন্ড' প্রকাশের যে তারিখ উল্লেখ আছে [25 June 1881 (শনি ১২ আষাঢ়)] প্রশান্তকুমার পালের মতে সে তারিখটি ভুল। তিনি মনে করেন গ্রন্থটি আষাঢ় মাসে নয় "বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়"।[১] ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হলেও 'রুদ্রচন্ড' লেখা হয়েছিল অনেক আগেই। এর রচনাকাল নির্ধারণ করতে গিয়ে সমালোচকেরা দুটিভাগে বিভক্ত হয়েছেন। এই বিভাজনের সূত্রটি মিলেছে নাটকের 'উপহার' অংশ থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম নাটকটি উপহার দেন 'ভাই জ্যোতি দাদা'কে। 'উপহার' শিরোনাম দিয়ে লেখেন —

ভাই জ্যোতিদাদা

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা নহে ভাই!
কোথাও পাই নে খুঁজে যা তোমারে দিতে চাই!
আগ্রহে অধীর হ'য়ে ক্ষুদ্র উপহার ল'য়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিতেছি ছুটিয়া তোমারি পাশ,
দেখাতে পারিলে তাহা পূরিত সকল আশ।
ছেলেবেলা হ'তে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কতনা যতন ক'রে
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে।
সে স্নেহ আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে

তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।
যতখানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই --
তবু যাহা সাধ্যছিল যতনে এনেছি তাই!

'সে স্নেহ আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে' অর্থাৎ বিলেত যাত্রার পূর্বে 'রুদ্রচন্ড' রচিত হয় এই ধারণা সমালোচকদের। প্রশ্ন হচ্ছে কোনবার বিলেত যাত্রার পূর্বে 'রুদ্রচন্ড' রচিত? প্রথমবার না দ্বিতীয়বার? আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮-এ প্রথমবার বিলেত যাত্রা করেন।[১] দ্বিতীয়বার যাত্রা করেন ২২ এপ্রিল ১৮৮১।[২] যদিও এই দ্বিতীয়বার যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ বিলেত পৌঁছাতে পারেননি, ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের প্ররোচনায় মাদ্রাজ থেকেই ফিরে এসেছিলেন।

প্রথমবার বিলেত যাত্রার পূর্বে 'রুদ্রচন্ড' এর রচনার পক্ষে মত প্রদান করে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখেছেন, ''প্রবাসে যাইবার কথা উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে ইহা বিলেত যাত্রা করিবার পূর্বে লেখা। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার বিলেত যাত্রা করেন তখন তাঁহার বয়স সতেরো বৎসর, তাহার পূর্বে লেখা হইয়া থাকিলে, 'রুদ্রচন্ড' নাটিকাটিকে ষোল সতেরো বৎসর বয়সের লেখা বলা যায়।''[৩] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ''রুদ্রচন্ডের মুদ্রণকাল জানি, কিন্তু তাহার রচনা কাল সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।''[৪] ড: সুকুমার সেন- এর মতে, ''ইহা রবীন্দ্রনাথের আমেদাবাদ থাকাকালে প্রথমবার বিলেত যাত্রার আগে লেখা এমন অনুমান অপরিহার্য নয়। দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রার প্রারম্ভে ইহা রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল।''[৫] এছাড়া প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রুদ্রচন্ড' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বোলপুরে আসিয়া 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে যে কাব্য রচনা করেন (মার্চ ১৮৭৩) এই 'রুদ্রচন্ড' তাহারই নাট্যরূপ। নাটকের ভাষা অপরিণত। আমাদের মনে হয় বিলাত যাইবার পূর্বে তাড়াতাড়িতে নূতন কিছু সৃষ্টি-প্রেরণার অভাবে পুরাতন রচনাটিকে নূতন কলেবরে সাজাইয়া 'জ্যোতিদাদা'কে উপহার দিলেন।[৬]

প্রশান্তকুমার পাল এই মন্তব্যগুলো আলোচনা করে লিখেছেন—

> রবীন্দ্রজীবনী-কার 'নূতন কিছু সৃষ্টি-প্রেরণার অভাবে পুরাতন রচনাটিকে নূতন কলেবরে সাজানোর যে কথা লিখেছেন, আমাদের কাছে সেটিও খুব গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার অব্যবহিত পূর্বের কয়েকটিমাস রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সৃষ্টিশীল সময়। সন্ধ্যাসংগীত-এর প্রাথমিক কয়েকটি

> কবিতা, মাঘোৎসবের গান, বাল্মীকি প্রতিভা এবং 'সঙ্গীত ও ভাব' প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর সৃজনশক্তিকে এই সময়ে তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেছেন। সুতরাং অন্যতম প্রিয়জন 'জ্যোতিদাদা'কে উপহার দেবার জন্য তাড়াহুড়োয় পুরোনো রচনাকে নূতন রূপ দিলেন এমন কথা মেনে নেওয়া শক্ত। সেই জন্যই উপহার কবিতায় পরবাসে যাওয়ার উল্লেখটিকে অবলম্বন করে প্রথমবার বিলাতযাত্রার কথাই ভাবতে হয়।[৮]

'রুদ্রচন্ড'-এর দুটি গানের ('বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল' এবং 'তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল') কথা উল্লেখ করে (যে গান দুটি রয়েছে 'মালতী পুঁথি'র 15/ ৮ক, 16/৮খ এবং 13/৭ক পৃষ্ঠায়) প্রশান্তকুমার পাল মন্তব্য করেছেন, ''মালতী পুঁথি-র ওই বিশেষ পৃষ্ঠা গুলিতে লেখা রুদ্রচন্ড-এর গানদুটি উক্ত নাটিকার রচনাকালের অন্যতম ইঙ্গিতবাহী।... গান দুটির রচনার সময়কালেই রুদ্রচন্ড গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল প্রথমবার বিলাতযাত্রার পূর্বেই এবং সম্ভবত 'উপহার' কবিতা-সহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে প্রেরিত হয়েছিল।''[৯] প্রশান্তকুমার পালের এই যুক্তি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তাঁর সঙ্গে আমরাও একমত যে 'রুদ্রচন্ড'-এর রচনাকাল প্রথমবার বিলাতযাত্রার পূর্বে অর্থাৎ ১৮৭৮ এর ২০ সেপ্টেম্বরের পূর্বে।

'রুদ্রচন্ড' চৌদ্দটি দৃশ্যের একটি ছোট্ট নাটিকা। প্রথম দৃশ্য পর্বতগুহা, সময় রাত্রি। এই দৃশ্যে রুদ্রচন্ড তার মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার জন্য কাল ভৈরবের প্রতিমার সামনে প্রার্থনা করছে। রুদ্রচন্ডের . মনের আকাঙ্ক্ষাটি কি? আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে পৃথ্বীরাজকে হত্যা করা। কারণ, পৃথ্বীরাজ তাকে রাজ্যচ্যুত করেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য, অরণ্য। পিতা রুদ্রচন্ড তার কন্যা অমিয়াকে সাবধান করে দিয়ে বলছে চাঁদকবি যেন এই অরণ্যে না আসে। কারণ, চাঁদকবি পৃথ্বীরাজের সভাসদ। কিন্তু চাঁদকবি অমিয়ার ভাই-এর মত। তাই অমিয়ার করুণ আকূতি --

সে আমার আপনার ভায়ের মতন --
বল মোরে বল পিতা কেন দেখিবনা তারে!
কেন তার সাথে আমি কহিব না কথা!

রুদ্রচন্ড-এর অন্তরে রাজ্য হারানোর যন্ত্রণা। পৃথ্বীরাজের কারণেই আজ তার এই অরণ্যে নির্বাসন। আর তাই প্রতিশোধ নেবার জন্য রুদ্রচন্ড দৃঢ় সংকল্প --

এই বাহু যদি নাহি হয়গো অসাড়,
রক্তহীন যদি নাহি হয় এ ধমনী,

তবে এই ছুরিকাটি এই হস্তে ধরি
উরসে খোদিব তার মরণের পথ।

তৃতীয় দৃশ্য, অরণ্য। চাঁদকবি এসেছে অমিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। অমিয়া শঙ্কিত কখন পিতা রুদ্রচন্ড এসে পড়ে। দু'জনের কথোপকথনের মধ্যে রুদ্রচন্ড এসে উপস্থিত হয়। এরপর চাঁদকবির সঙ্গে রুদ্রচন্ডের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ এবং যুদ্ধে রুদ্রচন্ডের পরাজয়। এ সময় এক অশ্বারোহী দূতের প্রবেশ। এই দূত এসে জানায় রাজ্যে ভীষণ বিপদ উপস্থিত। এই খবর শুনে দূতের সঙ্গে চাঁদকবির প্রস্থান করে।

চতুর্থ দৃশ্যে কোন স্থানের উল্লেখ নেই। এই দৃশ্যে রুদ্রচন্ড ভীষণভাবে উত্তেজিত এবং অমিয়ার প্রতি ক্ষিপ্ত। এই উত্তেজনা এবং ক্ষিপ্ততা পূর্ববর্তী দৃশ্যের সূত্র ধরেই এসেছে। চাঁদকবির প্রতি অমিয়ার আকর্ষণের কারণেই অমিয়ার প্রতি রুদ্রচন্ড ক্ষিপ্ত। অমিয়াকে সে বলে, "দূর হ রাক্ষুসি, তুই এখনি দূর হ।" অমিয়া বুঝতে পারেনা কি তার অপরাধ। "চাঁদের সহিত দুটি কথা কয়েছিনু" তার জন্য এত শাস্তি ভোগ করতে হবে কেন? প্রতিশোধ স্পৃহার আগুনে রুদ্রচন্ড জ্বলছে তাই অমিয়ার করুণ মিনতি "ক্ষমা কর, ক্ষমা কর পিতা" তাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারে না। কন্যাকে সে আদেশ করে, "-- শোন শেষ আদেশ আমার-- / দূর হ রে --।" পিতার এই নির্মম আচরণ কোমলপ্রাণ অমিয়া সহ্য করতে পারে না, সে মূর্চ্ছা যায়। এই দৃশ্যে স্থানের উল্লেখ না থাকলেও অমিয়ার একটি সংলাপে আমরা বুঝতে পারি দৃশ্যটি কোথায় এবং কখন সংঘটিত হচ্ছে --

অমিয়া। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর পিতা!
আজ রাতে দূর ক'রে দিওনা আমারে,
এক রাত্রি তরে দাও কুটীরে থাকিতে।

এই সংলাপই প্রমাণ করে যে স্থান হচ্ছে অরণ্যে রুদ্রচন্ডের কুটির এবং সময় রাত্রি।

পঞ্চম দৃশ্যে অমিয়া একা। স্থান রাজপথে প্রাসাদের সম্মুখে। রুদ্রচন্ড তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। অমিয়া 'শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবর', সারাদিন পথে পথে ঘুরছে "চাঁদ, চাঁদ, কোথা গেলে ভাইটি আমার" বলে। চাঁদকবির সন্ধানে সে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে চায় কিন্তু দ্বাররক্ষক তাকে ঢুকতে দেয় না। একজন পথিকের সঙ্গে অমিয়ার দেখা হয় পথিক তাকে বনের মধ্যে তার কুটীরে নিয়ে যায়।

ষষ্ঠদৃশ্য, স্থান শিবির, চাঁদকবি একা। এখানে চাঁদকবি অমিয়ার কথা ভাবছে, যুদ্ধ শেষ হলে নিষ্ঠুর পিতার হাত থেকে অমিয়াকে উদ্ধার করে তার নিজের কাছে রাখবে। একদিন রাজপুত ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে অমিয়ার বিয়ে হবে। এই চিন্তার মাঝে একজন দূতের প্রবেশ। দূত জানায় শত্রু খুব নিকটে চলে এসেছে।

এরপর শুরু হয় যুদ্ধের আয়োজন।

সপ্তম দৃশ্য, স্থান বন। একজন দূতের সঙ্গে রুদ্রচন্ডের কথোপথন। দূত জানায় 'রাজ রাজ মহারাজ মহম্মদ ঘোরী' তাকে প্রেরণ করেছে। পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করতে তিনি আসছেন। সৈন্যরা ক্লান্ত, এক রাত্রির জন্য তারা এই অরণ্যে আশ্রয় নিতে চায়। দূতের এই কথায় রুদ্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কারণ তস্করের মত আক্রমণে রুদ্রচন্ড বিশ্বাস করে না। তাই সে বলে যে, নগরে নগরে গিয়ে আমি ঘোষণা করে দেব --

ম্লেচ্ছ সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী
তস্করের মত আসে আক্রমিতে দেশ।

শুধু 'তস্করের মত' অথবা 'ম্লেচ্ছ সেনাপতি'র কারণেই নয় রুদ্রচন্ডের ক্ষিপ্ততার পিছনে মূল কারণটি অন্য। যখন আমরা রুদ্রচন্ডকে বলতে শুনি —

মহম্মদ ঘোরী ?
কেন, আমার কি কাছে ছুরি নাই মূঢ়!
এতদিন বক্ষে তারে করিনু পোষণ,
প্রতি দন্ডে দন্ডে তারে দিয়েছি আশ্বাস।
আজ কোথা হতে আসি মহম্মদ ঘোরী
তাহার মুখের গ্রাস লইবে কাড়িয়া?

তখনই আমরা বুঝিতে পারি রুদ্রচন্ডের দীর্ঘদিনের যে লালিত আকাঙ্ক্ষা তা সে একাই পুরণ করতে চায়। পৃথ্বীরাজকে হত্যা করার তার যে সুদীর্ঘ বাসনা সেই বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সে কারও সাহায্য নিতে প্রস্তুত নয়। এ আকাঙ্ক্ষা তার একান্ত আপনার। রাজ্য হারানোর নিদারুণ যন্ত্রণা যা রুদ্রচন্ডকে তিলে তিলে সংকল্পে দৃঢ় করেছে, প্রস্তুত করেছে তা সে অন্যকারও দ্বারা সংঘটিত হতে দিতে চায় না। রুদ্রচন্ডের এই সংকল্পের দৃঢ়তা সংগ্রাম মুখর মানুষের যা মানব সভ্যতা সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই বর্তমান তার কথা স্মরণ করায়। প্রতিটি মানুষ অন্তরে কিছু না কিছু আকাঙ্ক্ষা লালন করে যা সে একক শক্তিতে পুরণ করতে চায়, সেই চিরায়ত আকাঙ্ক্ষার এক ভিন্ন মাত্রিক রূপ রুদ্রচন্ডের চরিত্রের মধ্যে আমরা পেয়ে যাই। সপ্তম দৃশ্যটি রুদ্রচন্ডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের এক চরম অবস্থান বলে আমরা মনে করি

অষ্টম দৃশ্য, পথ দিয়ে চলেছে পৃথ্বীরাজের সৈন্য, সেনাপতি এবং চাঁদকবি। নেপথ্য থেকে অমিয়ার গান ভেসে আসে, "তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল/ মুদিয়া আসিছে আঁখি তার।" চাঁদ কবির

কাছ থেকেই অমিয়া এ গান শিখেছে (তৃতীয় দৃশ্য)। এ প্রসঙ্গে তৃতীয় দৃশ্যের অন্য একটি গানের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। গানটি হচ্ছে, "বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল / প্রথম মেলিল আঁখি তার,/ চাহিয়া দেখিল চারিধার"। এই গানটিও অমিয়া শিখেছিল চাঁদ কবির কাছ থেকে। এই দুটি গানের দুই 'মালতীর ফুল'-এর অবস্থা দু'রকমের। তৃতীয় দৃশ্যের গানটিতে রয়েছে বসন্ত প্রভাতে একটি মালতী ফুল চোখ মেলে দেখছে জগতের সৌন্দর্য। চোখে প্রথম দেখার বিস্ময় - "একি হর্ষ - হর্ষ আজি গো"! -

আকাশ সুনীল আজি কিবা
অরুণ নয়নে হাস্যবিভা
বিমল শিশির ধৌত তনু
হাসিছে কুসুমরাজি গো -
একি হর্ষ - হর্ষ আজি গো !

অষ্টম দৃশ্যে সেই মালতীর ফুল 'তরু তলে ছিন্ন বৃন্ত'। আঁখি তার বন্ধ হয়ে আসছে। চারিদিকে চেয়ে দেখল—

শুষ্ক তৃণরাশি-মাঝে একেলা পড়িয়া,
চারিদিকে কেহ নাই আর,
নিরদয় অসীম সংসার।

এই মালতী ফুল অমিয়া নিজেই। তার জীবনের আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়েছে। আনন্দময় সংসার 'নিরদয় অসীম সংসারে' রূপান্তরিত। রূপক ব্যবহার পরবর্তী রবীন্দ্রনাটকের একটি ধর্ম, এখানে আমরা খুব প্রাথমিকভাবে তার ব্যবহার লক্ষ করি। চাঁদকবি অমিয়ার এই গান শুনতে পায় কিন্তু যুদ্ধযাত্রার কারণে থামতে পারে না। অমিয়া শুধু "চাঁদ, চাঁদ ভাই মোর" এটুকুই বলতে পারে। সৈন্যরা তাকে তাড়িয়ে দেয়। যুদ্ধযাত্রার এই নির্মম মুহূর্তে যে কেউ কারো নয় এই সত্যটি এই দৃশ্যে প্রস্ফুটিত। যেতে যেতে চাঁদকবি শুধু বলে যায় "অমিয়ারে ফিরে এসে -।" এই দৃশ্যটিতে পথের গতিশীল তার একটি বৈশিষ্ট্য চকিতে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। নাট্যদৃশ্যের গতিশীলতাও এরই মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

নবম দৃশ্য, স্থান — নগর। এই দৃশ্যে রুদ্রচন্ডকে আমরা নগরের মধ্যে দেখতে পাই। রুদ্রচন্ডের মুখেই আমরা শুনতে পারি, "বেধেছে তুমুল রণ"। রুদ্রচন্ড খুঁজছে পৃথ্বীরাজকে। প্রার্থনা করছে —

ওরে সংগ্রাম দৈত্য শোণিত পিপাসী
সমস্ত হস্তিনা তুই করিস রে গ্রাস,
পৃথ্বীরাজকে রেখে দিস এ ছুরিকা তরে

কারণ পৃথ্বীরাজকে রুদ্রচন্ড নিজ হাতে হত্যা করতে চায়। সমস্ত নগরে যুদ্ধের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়েছে, মানুষ ছুটছে। কোলাহলের মধ্যে রুদ্রচন্ড খুঁজছে পৃথ্বীরাজকে। এই দৃশ্যে নাট্যগতি আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

দশম দৃশ্য, পথ। এই পথের দৃশ্যে শুধু অমিয়া একা। তার একটি মাত্র সংলাপের মাধ্যমে এই দৃশ্যের সমাপ্তি। এই দৃশ্যে অমিয়ার মনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে—

চলে গেল! — সকলেই চলে গেল গো!
দিন রাত্রি পথে পথে করিয়া ভ্রমণ
এক মুহূর্তের তরে দেখা হল যদি,
চলে গেল? একবার কথা কহিল না?
একবার ডাকিল না 'অমিয়া' বলিয়া?

অষ্টম দৃশ্যে চাঁদকবির যুদ্ধে যাওয়া, অমিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়া, কথা বলতে না পারা- তারপর দশম দৃশ্যে অমিয়ার এই সংলাপ। এই সংলাপে উঠে এসেছে অমিয়ার যন্ত্রণাময় একাকী জীবনের কথা।

একাদশ দৃশ্য। এখানে স্থানের উল্লেখ নেই। কিন্তু ধারণা করে নিতে অসুবিধা হয় না যে দৃশ্যটি নগর পথেই সংঘটিত হচ্ছে। এই দৃশ্যটি ছোট। প্রথম নাগরিকের সংলাপের মাধ্যমে আমরা যুদ্ধের ফলাফল জানতে পারি—

সমাচার দাও সবে ঘরে ঘরে গিয়া
শুনিতেছি পরাজয় হয়েছে মোদের।

এ পরাজয় মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক পৃথ্বীরাজের। দ্বিতীয় নাগরিক আহ্বান জানাচ্ছে সবাইকে অস্ত্র হাতে নিয়ে নগর রক্ষা করার। তৃতীয় নাগরিক ঘরে ঘরে চিতানল জ্বালাতে বলছে, কারণ—

নগরশ্মশানে আজ রমণীরা যত
প্রাণ বিনিময়ে মান রাখিবে তাহারা।

বিজাতীয় রাজা মহম্মদ ঘোরীর হস্তিনা নগর দখল করার কারণে এই আহ্বান। জাত-ধর্ম খোয়ানোর চেয়ে এ আয়োজন সাধারণ মানুষের কাছে শ্রেয়তর বলে মনে হচ্ছে। চতুর্থ নাগরিককে তাই আমরা বলতে শুনি—

মরণ-উৎসব আজ হইবে নগরে।
চিতার মশাল জ্বালি শোণিতমদিরা
যমরাজ আজ রাত্রে করিবেন পান।

এসময় দূত এসে খবর দেয় যে পৃথ্বীরাজ বন্দী হয়েছেন। দূতের এ খবরে নাগরিকগণ আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা বলে, ''লাগাও আগুন তবে নগরে নগরে।'' ''ভেঙ্গে ফেল অট্টালিকা''! ''ভস্ম কর গ্রাম''! সমবেত কণ্ঠে তারা বলে ওঠে, ''সমভূমি ক'রে ফেল হস্তিনা নগরী''। ছোট এই দৃশ্যটিতে গতিশীলতা রয়েছে চমৎকার ।

দ্বাদশ দৃশ্যে স্থানের উল্লেখ নেই । ধারণা করা যায় যে দৃশ্যটি অরণ্যে রুদ্রচন্ডের কুটীরে সংঘটিত হচ্ছে। এই দৃশ্যে রুদ্রচন্ডের আশা ধুলিসাৎ হয়ে যেতে দেখি আমরা । দীর্ঘদিনের লালন করা আকাঙ্ক্ষা ভেঙে যায় যখন রুদ্রচন্ড দূতমুখে শুনতে পারে পৃথ্বীরাজ বন্দী অবস্থায় হত হয়েছেন । কিন্তু সে বিশ্বাস করতে চায় না, ''মরেনি সে, মরেনি, মরেনি পৃথ্বীরাজ''। এখন পরাজিত রুদ্রচন্ড । রাজ্য হারানোর পরাজয়ের চেয়ে আশাভঙ্গের পরাজয় আরও তীব্র হয়ে ওঠে । রুদ্রচন্ডের সকরুণ আর্তনাদ -

মুহূর্তে জগত মোর ধ্বংস হয়ে গেল ।
শূন্য হয়ে গেল মোর সমস্ত জীবন !
পৃথ্বীরাজ মরে নাই, মরেছে যে জন
সে কেবল রুদ্রচন্ড, আর কেহ নয় ।
যে দুরন্ত দৈত্যশিশু দিনরাত্রি ধ'রে
হৃদয়মাঝারে আমি করিনু পালন,
তারে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল,
পৃথিবীতে আর কিছু ছিল না আমার,
তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন -
এ মুহূর্তে মরে গেল সেই বৎস মোর !
তারি নাম রুদ্রচন্ড, আমি কেহ নই ।

এখানে এসে রুদ্রচন্ডের করুণ পরিণতি লক্ষিত হয় । রুদ্রচন্ডের আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুর ফলে তার এই করুণ পরিণতি । এখানে আমরা এক রুদ্রচন্ডের ভিতর আরেক রুদ্রচন্ডের বেড়ে ওঠার সন্ধান পাই । যে বেড়ে উঠলো সে প্রতিশোধ স্পৃহার আগুনে অগ্নিময় 'দুরন্ত দৈত্য শিশু'। এই 'দুরন্ত দৈত্য শিশু' তার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি । এই প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি যা দীর্ঘদিনের লালনে পরিপুষ্ট হয়েছে, ভয়ঙ্কর হয়েছে ''তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন''। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তারও মৃত্যু সংঘটিত হ'ল। আর যার মৃত্যু হল, ''তারই নাম

রুদ্রচন্ড, আমি কেহ নই''। রয়ে গেল অস্তিত্বহীন রুদ্রচন্ড। যার মধ্যে আর কখনো প্রতিশোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত হবে না। কারণ যাকে ঘিরে এই প্রজ্জ্বলন সেই তো মৃত। সুতরাং বেঁচে থাকার কোন রকম ইচ্ছা আর রুদ্রচন্ডের থাকে না । তাই সে নিজ বক্ষে ছুরি বিদ্ধ করে আত্মঘাতী হয়। পিতার অন্তিম মুহূর্তে অমিয়া প্রবেশ করে। অমিয়াকে দেখে রুদ্রচন্ড বলে ওঠে -

আয় মা অমিয়া মোর, কাছে আয় বাছা !
এত দিন পিতা তোর ছিলনা এ দেহে,
আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া।

প্রতিশোধ স্পৃহায় রুদ্রচন্ড এতদিন অন্ধ হয়েছিল, মরে গিয়েছিল তার পিতৃত্ব। আজ সেই পিতৃত্ব 'সহসা' ফিরে এল। অমানবিকতার অন্ধকার ভেদ করে ফুটে উঠলো মানবিকতার আলো। রুদ্রচন্ডের ঘটলো মানবিক উত্তরণ। আমরা একে মানসিক উত্তরণ হিসেবেও চিহ্নিত করতে চাই। রবীন্দ্রনাট্যে এই মানবিকতা এবং অমানবিকতার দ্বন্দ্ব পরিণামে মানবিকতার জয় যা তাঁর পরিণত অর্থাৎ নিজস্ব ধারার নাটকে আরও বেশি ভাবে প্রকাশিত তার বীজ আমরা তার প্রথম নাটক 'রুদ্রচন্ড'-এর মধ্যেই খুঁজে পাই। অশ্রুকুমার সিকদারের মতে, ''রবীন্দ্রনাট্যে তত্ত্বগত বিচারে বিষয়বস্তু একটি মাত্র, জড়শক্তির সঙ্গে প্রাণশক্তির বিরোধ এবং পরিণামে প্রাণের অবশ্যম্ভাবী জয়লাভ।''[১০] 'রুদ্রচন্ড'-এ এই বিরোধেরই আভাস ক্ষীণভাবে দেখা দিয়েছে । অশ্রুকুমার সিকদার আরও জানাচ্ছেন, ''জড়ত্ব ও প্রাণের বিরোধ তাই বন্ধন ও মুক্তির বিরোধে রূপান্তরিত এবং সেই বিরোধের ফল বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তির মহৎ প্রকাশে''[১১] । ''আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া''— এই ফিরে আসা বন্ধন ও মুক্তির দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে 'মুক্তির মহৎ প্রকাশে'রই এক ভিন্ন মাত্রিক রূপ। সমগ্র 'রুদ্রচন্ড'-এ এই বিরোধ কোনখানেই পরিলক্ষিত হয় না। আমরা রুদ্রচন্ডকে দেখি একরোখা, জেদি, প্রতিহিংসার আগুনে প্রজ্জ্বলিত। তার ধ্যান-জ্ঞান শুধু পৃথ্বীরাজকে হত্যা করা, শুধু এক সরল রৈখিক অগ্রসরতা। যেখানে পৃথ্বীরাজকে হত্যা করার বাসনা ছাড়া আর অন্য কোন মাত্রা যুক্ত হয়নি। কিন্তু এই সরল রেখাই যেন কাহিনীর শেষে এসে সামান্য পরিমান বেঁকে গিয়ে অন্য এক আলোর সন্ধান দিয়ে যায়, মানবিক মুক্তির সন্ধান দিয়ে যায়। এই পথই রবীন্দ্রনাট্যের প্রকৃত পথ।

ত্রয়োদশ দৃশ্য, স্থানের উল্লেখ নেই। শুধু চাঁদকবি সন্ন্যাসী বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।পৃথ্বীরাজ ও অমিয়ার কথা স্মরণ করছেন। চতুর্দশ দৃশ্যে চাঁদকবিকে দেখা যায় বনে রুদ্রচন্ডের কুটীরে। তার সামনে মৃত রুদ্রচন্ড ও মৃতপ্রায় অমিয়া এবং কিছুক্ষণ পর অমিয়া মৃত্যু বরণ করে।

'রুদ্রচন্ড'-এ দুটি ধারা। একদিকে রুদ্রচন্ড একা, অন্য দিকে চাঁদকবি ও অমিয়া। এক ধারায় প্রতিহিংসার আগুন অন্যধারায় ভালবাসার পবিত্র আলো। 'রুদ্রচন্ড'-এ প্রেমের স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী রচনা যেমন 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' এবং 'ভগ্নহৃদয়' থেকে ভিন্ন। সুকুমার সেনের মতে, ''পূর্ব্ববর্ত্তী গাথা কাব্যের সঙ্গে রুদ্রচন্ডের পার্থক্য হইতেছে প্রেম রসের স্থানে সৌভ্রাত্ররসের প্রবর্ত্তনে।''[১২] নরনারীর প্রেমের গদ্‌গদ ভাবের থেকে অমিয়া এবং চাঁদকবির অবস্থান স্বতন্ত্র। এই দুইজনকে আমরা জীবনের সুস্থদিক, স্বাভাবিক দিকের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি আর রুদ্রচন্ডকে জীবনের অসুস্থদিক, অস্বাভাবিক দিকের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি । এই দুই ধারার সংঘাত এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে আমরা পেয়ে যাই, যদিও এর গাঢ়ত্ব খুবই সামান্য। রুদ্রচন্ডের আলোর দিকে নিষ্ক্রমণ অথবা বন্ধন মুক্তি ঘটে তার আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। এ আকাঙ্ক্ষা বীভৎস এবং প্রতিশোধমূলক। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রচন্ডের আকাঙ্ক্ষারও মৃত্যু ঘটে। বেরিয়ে আসে মানুষ রুদ্রচন্ড, স্নেহবৎসল পিতা রুদ্রচন্ড।

'রুদ্রচন্ড'কে সুকুমার সেন গাথা কাব্যের সগোত্র বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩] গাথা-কাব্যের ধারাবাহিকতায় 'রুদ্রচন্ড'-এ গাথা কাব্যের বৈশিষ্ট্য হয়তো সামান্য পরিমাণ থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে ''ইহাই রবীন্দ্রনাথের শেষ গাথা-কাব্য'' জাতীয় মন্তব্য করে 'রুদ্রচন্ড'-এর নাট্যদাবী খারিজ করা সম্ভব নয়। কারণ ''বিলেতে আর একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল''[১৪] এবং 'ভগ্নহৃদয়' নামে যা ছাপান হয়েছিল তার মধ্যেই নাট্যের আভাস পরিলক্ষিত হয়। 'ভগ্নহৃদয়' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণী ''এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন''[১৫] তা স্মরণে রেখেও আমরা ভাবতে বাধ্য হই যে, 'ভগ্নহৃদয়' নাট্যলক্ষণাক্রান্ত। এই নাট্যলক্ষণ শুধু 'ভগ্নহৃদয়'-এ নয় 'কবি কাহিনী' এবং'বনফুল'-এর সংলাপ ধর্মিতার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের এ কথার সমর্থন মেলে শেখর সমাদ্দারের লেখায়। তিনি লিখেছেন, ''ভগ্নহৃদয় ছাড়াও তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গকাব্য 'বনফুল' ('জানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব ' পত্রের অগ্র - আশ্বিন - কার্তিক ১২৮৩ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ, গ্রন্থ প্রকাশ ৯ মার্চ ১৮৮০)-কে কবি নিজে বলেছেন 'কাব্যোপন্যাস'। এই কাব্যেও নাট্য উপাদান আছে, কাহিনীর গতি এই কাব্যেও নাট্যময় সংলাপ ধর্মে নির্ভর খুঁজছে। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কবিকাহিনী' (৫নভেম্বর ১৮৭৮) এবং 'শৈশব- সংগীত' কাব্যের টুকরো কবিতাগুলিতেও আছে নাট্য লক্ষণ।''[১৬] এসমস্ত কিছু বিবেচনায় এনে তাই 'রুদ্রচন্ড'কে রবীন্দ্রনাথের শেষ গাথা কাব্য বলে আমরা মেনে নিতে পারি না। নাটক হিসেবে 'রুদ্রচন্ড'-এর সার্থকতা কতটুকু তা বিশ্লেষণের আগে 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' এবং 'ভগ্নহৃদয়'-এর ধারাবাহিকতার পর্যালোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা বলে আমাদের বিশ্বাস।

বনফুল

'কবিকাহিনী' প্রথম প্রকাশিত হলেও 'বনফুল' রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম কাব্য। ৯ মার্চ ১৮৮০ সালে 'বনফুল' প্রকাশিত। কিন্তু 'বনফুল' রচিত হয়েছিল আগেই। ''এই কাব্যের রচনা কাল অন্তত: আরো চার বৎসর পূর্বে। কারণ, 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামক মাসিক পত্রে (সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাস) ১২৮২ সালের অগ্রহায়ন হইতে ১৮৮৩ সালের আশ্বিন-কার্তিক পর্যন্ত ইহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।''[১৭] সুতরাং চার বছর পিছিয়ে নিলে 'বনফুল' রবীন্দ্রনাথের ১৫ বছর বয়সের রচনা। রবীন্দ্রনাথ একে 'কাব্যোপন্যাস' বলে উল্লেখ করেছেন। 'বনফুল' কমলা, নীরদ, বিজয় এবং নীরজার কাহিনী। কমলা পিতার সঙ্গে বনে বাস করত। পিতার মৃত্যু হলে বিজয় তাকে বন থেকে তার সংসারে নিয়ে আসে। এতদিন কমলা লোকালয় থেকে এবং পিতা ভিন্ন অন্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে কমলার ভিতরে সংসার এবং মানুষ সম্পর্কিত কোন বোধ জন্ম লাভ করতে পারেনি। লোকালয়ে মানুষের সংস্পর্শে আসার পর তার মানবিক অনুভূতিগুলি বিকাশ লাভ করে। এখানে এসে নীরদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। নীরদ বিজয়ের বন্ধু। কমলা নীরদকে ভালবাসতে শুরু করে। কমলা বিজয়ের স্ত্রী হলেও বিজয় তার মন পায় না। বিজয়ের ভালবাসাকে কমলা প্রত্যাখ্যান করে। তার কাছে নীরদ —

যেমন দেখিতে গুণও তেমন,
দেখিতে শুনিতে সকলি ভালো-
রূপে গুণে মাখা দেখিনি এমন,
নদীর ধারটি করেছে আলো!
আপনার ভাবে আপনি কবি
রাতদিন আহা রয়েছে ভোর।

নীরদ কবি, আপন মনে গান করে। গান শুনে মনে হয় তার অন্তরে প্রচুর বেদনা জমা রয়েছে। ''মোহিনী কল্পনে''কে সে তার বেদনার কথা শোনাচ্ছে— ''কি জানি লো বালা! কিসের তরে/ হৃদয় আজিকে কাঁদিয়া ওঠে।'' হৃদয়ের এই কেঁদে ওঠার কারণ গানের পরবর্তী কথায় পরিষ্কার হয়। নীরদ ভেবেছিল প্রকৃতির শোভায় হৃদয় ভরবে, নদীর কলতানে শ্রবণ পূর্ণ করবে, 'বাণীর সুধায়' হৃদয় ভরবে, ''ভুলিব প্রেম যে আছে এ ধরায়,/ ভুলিব পরের বিষাদ ব্যথায় / ফেলে কিনা ধরা নয়ন বারি।'' কিন্তু বিস্মৃতি কিছুতেই আসছেনা । নীরদ যাকে ভালবেসেছিল তাকে ভুলতে পারছে না এবং তাকে ভুলতেও চাচ্ছে না, ''পরাণ থাকিতে যাবনা ভুলে।'' নীরদ সম্পর্কে কমলার মনেও প্রশ্ন—

কিসের লাগিয়া মরমে মরিয়া

করিছে অমন খেদের গান?

কারে ভাল বাসে? কাঁদে কার তরে?

কমলার মনও চঞ্চল হয়ে ওঠে। মনে হয় সে যেন অন্তরে কার সাড়া পেয়েছে। আর তাই সে যত্ন করে নিজেকে নানা আভরণে সাজায়। কিন্তু কমলা যখন নীরদকে শুধিয়েছে সে কমলাকে ভালবাসে কিনা তার উত্তরে নীরদ তাকে বলেছে—

বিজয় তোমার স্বামী বিজয়ের পত্নী তুমি

সরলে! ও কথা তবে শুধাও কেমনে ?

কিন্তু কমলা বিবাহ, স্বামী, পত্নী কাকে বলে জানে না এবং 'কারে বলে ভালবাসা' আজও শেখেনি। কারণ যে এতদিন বনে বাস করেছে তার পক্ষে লোকালয়ের এইসব মানবিক বৃত্তি সম্পর্কে পরিচয় না থাকারই কথা। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসের কপালকুন্ডলার কথা। অধিকারীর মুখে বিয়ের কথা শুনে "বি-বা-হ" কথাটি কপালকুন্ডলা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেছিল। তারপর বলেছিল, "বিবাহের নাম তো তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানিনা।" (অষ্টম পরিচ্ছেদ: আশ্রয়ে) এই কথারই হুবহু প্রতিধ্বনি শোনা গেল কমলার মুখে "বিবাহ কাহারে বলে জানি না তা আমি।" (রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনাগুলোতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচুর প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শ্রী অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য)।[১৮] পরে কমলা ভেবেছে সে বিজয়কে তিরস্কার করবে না। কারণ বিজয় তাকে সংসারে নিয়ে এসে তার অন্তরের দ্বার খুলে দিয়েছে। আর সে কারণেই "হৃদয়ের অস্ফুটিত কলি" প্রস্ফুটিত হয়েছে। এই প্রস্ফুটনের কারণেই কমলার ভিতরে প্রেম-ভালবাসা সম্পর্কিত মানবিক বোধের উন্মেষ ঘটেছে। বনে যা ছিল পশুপাখীর জন্য, গাছপালার জন্য লোকালয়ে এসে তা মানুষের জন্য রূপান্তরিত হয়েছে। এই পরিবর্তন মানবিকতারই এক ভিন্নমাত্রিক রূপান্তর বলে আমাদের ধারণা। কমলা বিজয়কে জানায় এক হৃদয়ে দুজনের স্থান হতে পারে না, "নীরদেই ভালবাসা দিব চিরকাল,/ প্রণয়ের করিবনা কভু অপমান।" কমলার এই আত্মপ্রত্যয় পূর্ণ ঘোষণা আরও সুসংবদ্ধ রূপে প্রকাশিত হয় যখন সে বলে-- "এত পাপ নয় বিধি ! পাপ কেন হবে?/ বিবাহ করেছি বলে নীরদে আমার ভালবাসিব না?" এদিকে নীরজা বিজয়ের মন পায় না। আর সে কারণেই কমলাকে উদ্দেশ্য করে নীরজা বলে--

বনে ছিলি বনবালা সে ত বেশ ছিল--

জ্বালালি ! জ্বলিলি বোন! --

0 2 JAN 2002 15867

এরপর ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে বিজয় নীরদকে খুন করে। এ কারণে কমলা নিজেকে বিধবা মনে করে। নীরদের মৃত্যুর পর কমলার অন্তরে আক্ষেপ দেখা দেয়, ''বেশ ছিনু বনবালা বেশ ছিনু বনে।'' তার সংসারে আগমন তো জ্বালাতে এবং জ্বলতে। এরপর নীরদের দুঃখে ''কমলার জীবনের হল অবসান।''

'বনফুল' -- এর কাহিনী বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা যে চারটি চরিত্রের দেখা পাই তাদের সবারই একটা সাধারণ ধর্ম রয়েছে। এই সাধারণ ধর্মটি হচ্ছে বিষাদ। বিষাদের আবরণে এই চারজনই আচ্ছাদিত। বিষাদময়তা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি লেখার মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই। বলা যায় তাঁর প্রথম পর্যায়ের সাধারণ ধর্মই হচ্ছে বিষাদময়তা। প্রতিটি চরিত্রই ভীষণ নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতার নিদারুণ এক যন্ত্রণা নিয়ে সবাই চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। প্রায় প্রতি লেখাতেই একজন করে থাকছে কবি চরিত্র। 'বনফুল'-এর নীরদ ''আপনার ভাবে আপনি কবি''। বিষন্ন, একাকী। বিষাদময় এই কবি চরিত্রের উন্মেষ আরও ভালভাবে দেখা যাবে 'কবিকাহিনী'তে। কমলা চরিত্রের ক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় একজন বনবালা কি ভাবে মানুষের সংসারে এসে মানবিক কোমল প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে পড়ে। কিভাবে হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়ে মানবিকতার আলো সেখানে প্রবেশ করে। কমলা মানুষ হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা তাকে স্পর্শ করে। যদিও তার মাত্রা ভাবময়, বস্তুময় নয়। কিন্তু তবুও নীরজার উক্তি ''জ্বালালি! -- জ্বলিলি বোন!'' এই সংসারে মানুষের অবস্থানটি চিহ্নিত করতে আমাদের সাহায্য করে। 'বনফুল'-এ সংলাপময়তার মধ্যে আমরা নাটকের ফর্মের আভাস পাই।

কবিকাহিনী

'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হয় ৫ নভেম্বর ১৮৭৮। 'ভারতী' পত্রিকার ১২৮৪ সালের পৌষ থেকে চৈত্র সংখ্যায় 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হয়।[১৯] এক কল্পনাবিলাসী কবির কথা বর্ণিত হয়েছে এ কাব্যে। কবির শৈশব - কৈশোর - যৌবন প্রকৃতির রূপ মাধুর্য অন্বেষণ করে অতিবাহিত। কিন্তু কবির মনে শান্তি নেই। কবি ভেবেছে মহাপ্রকৃতির সঙ্গে অনন্ত প্রণয়ে মজে গিয়ে ''হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা'' মিটাবে। (এই আকাঙ্ক্ষা 'বনফুল'- এর কবি নীরদের মধ্যেও জেগেছিল, ''প্রকৃতি শোভায় ভরিব নয়নে,''...)। কিন্তু এই মহাপ্রকৃতিও কবির হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা মেটাতে পারল না। কারণ, ''মানুষের মন চায় মানুষেরই মন।'' 'গম্ভীর নিশীথিনী', 'সুন্দর ঊষাকাল', 'তটিনীর কলধ্বনি', 'নির্ঝরের ঝরঝর' ইত্যাদি ''পারে না পুরিতে তারা বিশাল মনুষ্যহৃদি।'' সুতরাং ''মানুষের মন চায় মানুষেরই মন।'' কবির এই বাসনা পুরণ হতে বিলম্ব হ'ল না। ''কে গো তুমি পথশ্রান্ত বিষন্ন পথিক''- বলে এক বালিকার আবির্ভাব ঘটলো। নলিনী নামের এই

বালিকা আরও জিজ্ঞাস করল, "কী দুঃখে উদাস হয়ে করিছ ভ্রমণ"? উত্তরে কবি জানায়, "প্রাণের শূন্যতা কেন ঘুচিল না বালা"? প্রাণের শূন্যতা পূরণের জন্য নলিনী কবিকে বনের মধ্যে তার কুটীরে নিয়ে গেল। মানুষের মন খুঁজে পেল মানুষের মন। জীবনে জীবন যোগ হ'ল। কবির মনে হ'ল, "আজ যেন একটু আশ্রয় পাইল হৃদি"। কিন্তু এই নলিনীও শেষ পর্যন্ত কবির হৃদয় পূরণ করতে পারল না। কবি বলছে, "আরো ঢালো ভালবাসা হৃদয়ে আমার।" কারণ, "এখনও পুরিল না প্রাণের শূন্যতা"। কিন্তু নলিনীর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, সে সবই দিয়েছে কবিকে । কবির ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা মিলিয়েছে, কবির সুখের সঙ্গে নিজের সুখ মিলিয়েছে। কিন্তু তবুও সে কবির প্রাণের শূন্যতা ঘুচাতে পারল না। তবে একি শুধু দু:খ বিলাস? কবি নিজেই বলেছে, "কাল্পনিক দু:খে এত কেন ম্রিয়মান?"

আমাদের মনে হয় এখানে রবীন্দ্রনাথের মানুষ ব্যক্তিমানুষ মাত্র নয় তা অসীম মানবতা, তা একটি ideal । কোন ব্যক্তির সীমাবদ্ধ সত্তা সেই ideal মানবতার আস্বাদ পূর্ণ করতে পারে না। সেজন্য এই কাতরতা এবং ideal - এর সন্ধানে পৃথিবী ভ্রমণ। " অনন্ত অতৃপ্তি তৃষ্ণা জ্বলিছে সদাই," তাই পরিমিত কিছু তার হৃদয় জুড়াতে পারে না । এ কারণে নলিনীকে রেখে কবিকে পুনরায় পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে হয় শান্তির অন্বেষায় কিন্তু তবুও শান্তি মেলে না। নলিনীবিহীন প্রকৃতি, অর্থাৎ মনুষ্যহীন প্রকৃতি কবির কাছে অর্থহীন মনে হয়। মনে হয় "নাইক দেবতা যেন মন্দির মাঝারে।" কবি পুনরায় ফিরে আসে কিন্তু এদিকে নলিনী কবির প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে মৃত্যুবরণ করেছে। কবির কাছে সব কিছু স্বপ্নের মত মনে হয়, যেন সব কিছু মিলিয়ে গেছে নিদ্রার সমুদ্রে। কবি এখন বৃদ্ধ। গিরিশৃঙ্গে বসে ভাবে মানুষে-মানুষে হিংসা, হানা- হানি, রক্তপাত কবে বন্ধ হবে। ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ কবে লুপ্ত হবে। কবে, "অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে, দেব,/ একগান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি।" কবে কেউ কারো প্রভু থাকবেনা, কেউ কারো দাস থাকবে না।

নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার!
সকলেই আপনার আপনার লয়ে
পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল-অন্তরে।

মানব কল্যাণকর এই চিন্তার মধ্য দিয়েই কবির জীবন শেষ হয়ে আসে। অশ্রুকুমার সিকদার এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "তিনি (কবি) এক শুভরাষ্ট্র কল্যাণময় সমসমাজের ইউটোপিয়ার স্বপ্ন দেখেন।"[২০] প্রকৃতির অন্তররহস্য উন্মোচনের আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি ধর্ম। প্রকৃতি সত্তা থেকে মানবজগৎ এবং

মানব জগৎ থেকে আবার প্রকৃতিতে ভ্রমণ যেন সেই সন্ধানেরই পরিচয় দেয়। এর মধ্যে আর একটি জিনিস পাই। কবি নলিনীকে পেয়ে ভেবেছিল হৃদয়ের শূন্যতা ঘুচবে। ঠিকই ভেবেছিল। কিন্তু অচিরে তার মনে হয়েছে শূন্যতা গেল না। তখন সে আবার বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। অর্থাৎ Particular-এর মধ্যে বা মানুষের মধ্যে অসীমতাকে পাওয়া যায় না। তাই অসীম রহস্যকে বুঝতে তাঁকে যেতে হয়েছে প্রকৃতির মধ্যে। কিন্তু শুধু প্রকৃতির মধ্যেও মানবহীন অবস্থায় সম্পূর্ণতা আসে না। তাই আবার কবিকে মানুষের জগতে ফিরে আসতে হয় নলিনীর কাছে। এখনো রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মনের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ করে বোঝেন নি। তাই এ রচনার পরিণতি এ রকম একটা ইউটোপিয়ায়। এই স্বপ্ন দেখার মধ্য দিয়েই হয়তো কবি খুঁজে পান তার মনের প্রশান্তি। এই প্রশান্তির অন্বেষণ পরবর্তী আত্মিক মুক্তির অন্বেষণের ঈষৎ আভাস। আত্মা বিষাদের অন্ধকারে আবদ্ধ, মুক্তির আলোতে নিয়ে আসাই কবির মূল লক্ষ। একদিকে প্রকৃতি আর এক দিকে মানুষ, দুই জগতেই কবি পরিভ্রমণ করলেন কিন্তু শান্তি কোথাও মিলল না। কবির জীবন প্রবাহ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা একটি পরিণতি লক্ষ করি, - যে পরিণতি মানব কল্যাণের কামনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। একে আমরা কবির মানসিক উত্তরণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

ভগ্নহৃদয়

'ভগ্নহৃদয়' ২৩ জুন ১৮৮১ মুদ্রিত হয়। 'ভগ্নহৃদয়' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''বিলাতে আর একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া সমাধা করি। ভগ্নহৃদয় নামে ইহা ছাপান হইয়াছিল।''[২১] রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে ''20 Sep 1878 [শুক্র ৫ আশ্বিন] তারিখে ইংলন্ড যাত্রা করেন।''[২২] আর ইংলন্ড থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে। প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন ''দ্বিতীয় সর্গটি বিলেত প্রবাস কালেই লিখিত হয়েছিল।''[২৩] অর্থাৎ ভগ্নহৃদয়ের কিছু অংশ বিলেতে, কিছু অংশ ফিরিবার পথে জাহাজে এবং বাকী অংশ দেশে ফিরে লেখা হয়। এই তিন ধাপে 'ভগ্নহৃদয়' লিখিত হয়। প্রশান্তকুমার পাল এ প্রসঙ্গে আরও জানিয়েছেন, ''কিন্তু এই সমস্ত স্থান কালের বিবরণ প্রকৃতপক্ষে ভগ্নহৃদয়ের উক্ত পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য। কারণ এই কাব্যের প্রকৃত সূচনা বহুপূর্বে-- সম্ভবত আমেদাবাদে থাকার সময় কিংবা আরও আগে।''[২৪] তিনি মনে করেন 'ভগ্নহৃদয়'-এর একটি 'অস্পষ্ট ধারণা' অনেক আগেই কবির মনে দানা বেঁধেছিল। আমাদের মতে বহুপূর্বে দানাবাঁধা 'অস্পষ্ট ধারণা'টি প্রস্ফুটিত হওয়ার ক্ষেত্রে আরও অনেক ধরনের ঘটনার অভিঘাত সংযোজিত হয়েছিল। বিশেষ করে বিলেত যাওয়ার প্রাক্কালে বোম্বাই-এ আত্মারাম পাণ্ডুরঙ-এর পরিবারে

ইংরেজী আদব-কায়দা শিখতে যাওয়া এবং সেই পরিবারের বিদূষীকন্যা আন্না তড়খড়-এর সান্নিধ্যলাভ, বিলেতে স্কট পরিবারে অবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলো 'ভগ্নহৃদয়'-এর ভাববস্তুকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে সহায়ক বলে আমাদের ধারণা।

'ভগ্নহৃদয়'-এর কাহিনী এক ভাবময় রাজ্যের কাহিনী। এ প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'-এর একটি অংশ স্মরণ করা যেতে পারে—

> আমার এই আঠারো বছর বয়সের কবিতা সম্বন্ধে আমার ত্রিশ বছর বয়সের পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম এইখানে উদ্ধৃত করি—
>
> ভগ্নহৃদয় যখন বিলেতে আরম্ভ করেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয়, যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগবি পৃথিবী হয়ে ওঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয় - আমার আশপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম । সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখ দু:খও স্বপ্নের সুখ দু:খের মত । অর্থাৎ , তার পরিমান ওজন করবার কোন সত্য পদার্থ ছিল না , কেবল নিজের মনটাই ছিল, তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত ।[২৫]

এই বয়স সন্ধিকালে অস্পষ্ট সত্যালোকে বস্তুহীন, ভিত্তিহীন কল্পনায় রচিত হ'ল 'ভগ্নহৃদয়'। এর পাত্র-পাত্রীরা সকলেই ভাবময় রাজ্যের বাসিন্দা । হৃদয় ঘটিত সমস্যায় প্রত্যেকেই জর্জরিত। ননিলীকে ঘিরে একটি ভালবাসার বলয়। একদিকে কবি ও মুরলার হৃদয়ঘটিত সমস্যা, আরেক দিকে অনিল ও ললিতা । নলিনীকে ভালবাসে অনেকেই কিন্তু নলিনী সকলের ভালবাসা নিয়ে খেলতে ভালবাসে কাউকে সে ধরা দেয় না । কবি ভালবাসে নলিনীকে আবার মুরলা ভালবাসে কবিকে । অনিল-ললিতার বিয়ে হলেও ললিতা পারে না পূরণ করতে অনিলের অন্তরের তীব্র প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে এবং এরই কারণে অনিলও একসময় নলিনীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। কবির ভালবাসা না পেয়ে মুরলা এক সময় দেশ ত্যাগ করে এবং ললিতাও অনিলের অবহেলা সহ্য করতে না পেরে দেশ ত্যাগ করে যায়। নলিনীকে ঘিরে যে ভালবাসার

বলয় তৈরী হয়েছিল তা ভেঙ্গে যায়। নলিনী হয়ে পড়ে একা। কবি ও অনিল তাদের ভুল বুঝতে পেরে মুরলা ও ললিতার কাছে ফিরে যায়। কিন্তু ততদিনে মুরলা মৃত্যু পথযাত্রী এবং ললিতা উন্মাদিনী । মৃত্যু পথযাত্রী মুরলার সাথে কবির মিলন ঘটে। একই স্থানে বাসর ও চিতা রচিত হয় । হৃদয়ের কারবারিরা শেষ পর্যন্ত সবাই ব্যর্থতার অন্ধকারে ঢেকে যায়

আমাদের মনে হয় নলিনী চরিত্রের ক্রমবিকাশের মধ্যে 'মায়ার খেলা'র মূলতত্ত্ব প্রস্ফুটিত হয়েছে। নলিনী 'বসন্ত সমীরন'-এর মত, 'কি বা দিবা কি বা রাতি পরিমল মদে মাতি' কাননে বিচরণ করে বেড়ানোই তার কাজ। সকলের হৃদয়ের তন্ত্রীতে সে ভালবাসার সুর বাজিয়ে দেয় কিন্তু কাউকেই সে ধরা দেয় না। তবে শুধু এখানে এসেই নলিনী চরিত্রটি থেমে যায়নি , পরিবর্তনের মধ্যদিয়েই এগিয়ে যায় সত্য উপলব্ধির দিকে । কবি, "মুরলা কোথায় ?/ সে বালা কোথায় গেল ? কোথায় ? কোথায় ?" বলে আক্ষেপ করে এবং নলিনীর থেকে দূরে সরে যায় । তখন নলিনীও বুঝতে পারে—

একে একে সবে তারে তেয়াগি যেতেছে হা রে -
কেন, সখি, হতেছে এমন !

নলিনীর মনে প্রশ্ন জাগে , "সংসার কেবলি তবে রূপের কাঙাল সবে ?" এ প্রশ্ন পূর্বেও জেগেছে নলিনীর মনে । সুরেশ যখন বলেছে—

যাইতে বলিছ বালা , কোথা যাব আর ?
দিগ্বিদিক হারাইয়া ও রূপ অনলে গিয়া
এ পতঙ্গ পাখা দুটি পুড়ায়েছে তার !
রূপসী, ক্ষমতা আর নাই উড়িবার । (দ্বাদশ সর্গ)

এর উত্তরে নলিনী বলছে—

রূপ কিছু মোর না যদি থাকিত
বড় হইতাম সুখী,
দেখিতাম যত পতঙ্গ তোমরা
আসিতে কি লোভ দেখি !
রূপ - রূপ -রূপ- পোড়া রূপ ছাড়া
আর কিছু মোর নাই ?
তোমাদের মত পতঙ্গের দল

চারিদিকে ঘিরে করে কোলাহল,
দিবস রজনী করে জ্বালাতন,
ঝাপায়ে পড়ে গো, না মানে বারণ -
পোড়া রূপ থেকে এই যদি হল
হেন রূপ নাহি চাই !
হেন কেহ নাই হায়
শুধু ভালবাসে ননিলী বালারে,
আর কিছু নাহি চায় ! (ঐ)

শ্রী প্রমথনাথ বিশী নলিনী চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, '' নলিনীকে প্রণয় বিলাসিনী বলা যাইতে পারে। অনেক গুলি মুগ্ধ হৃদয়কে সে নিজের চারিদিকে ঘুরাইয়া মারিতেছে; কাহাকেও ছাড়িবেনা, কাহাকেও ভালবাসিবেনা ।''[১৬] কিন্তু শেষ পরিচয়ে নলিনীকে আর শুধু মাত্র প্রণয়বিলাসিনী বলা যায় না । যখন নলিনী বলে, ''হেন কেহ নাই হায় / শুধু ভালবাসে নলিনী বালারে ...।'' তখন কি মনে হয় না যারা নলিনীকে ঘিরে ভালবাসার বলয় তৈরী করেছিল তারা শুধুই নলিনীর স্তুতিকার ছিল, রূপজ মোহের দাস ছিল ? প্রণয় নিয়ে বিলাসিতা করলেও অন্তরে অন্তর যোগের একটি কামনাও নলিনীর মধ্যে ছিল । ''হৃদয়ের দুয়ারের বাহিরে বসিয়া'' প্রণয়ের খেলার অবসান হ'লে নলিনীকে বলতে হ'ল—

নিতান্ত ভিখারী আজি দীন হীন বেশে সাজি
দুয়ারে দুয়ারে ভ্রমি আশ্রয়ের তরে,
সবাই ফিরায় মুখ উপেক্ষার ভরে।

আর তখনই নলিনীর সাধ জাগে কাউকে ভালবাসবার জন্য। আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সে সত্যালোকে আবিষ্কার করতে পেরেছে। নিতান্ত একাকী নলিনী একাকিত্বের তীব্র অন্তর জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে উপলব্ধি করেছে প্রকৃত ভালবাসার। যে ভালবাসা রূপের অনলে পোড়ায় না, পোড়ে না। যেখানে হৃদয়ের দুয়ারের বাইরে বসে শুধু খেলা নয়, তার আকাঙ্ক্ষা 'খেলা ছাড়া সত্যকার' জীবনের। যেখানে ''মনেতে মিশায়ে মন সচেতন অচেতন/ জগত হইয়া আসে মৃদু ছায়াময়,/ দুটি মন চেয়ে থাকে, দোঁহে দোঁহা ঢেকে রাখে--''। এই আত্ম উপলব্ধিতেই নলিনীর মুক্তি, নলিনীর মানসিক উত্তরণ। আরেকদিকে কবি ও অনিল আত্ম উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পৌঁছে যায় মুরলা ও ললিতার কাছে। 'ভগ্নহৃদয়' এ দুটি ধারা— একদিকে নলিনী - অন্য দিকে কবি-মুরলা, অনিল- ললিতা। নলিনীর ক্রম প্রকাশের যে ভাঙচুর তা কবি বা

অনিলের ক্ষেত্রে তেমন তীব্র নয়। নলিনী চরিত্রের মধ্যে নাটকীয় সংঘাতময়তাও লক্ষিত হয়। মুরলা ও ললিতার সঙ্গে নলিনীর প্রকাশময়তায় তফাৎ এইখানে-- মুরলা ও ললিতা যেন একটি সরল রেখা, কোথাও বাঁক নেয় না, আর নলিনী একটি বাঁকাচোরা রেখার অগ্রসরমানতা।

Alfred Tennyson (1809 - 1892) - এর একটি কবিতা রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন। কবিতাটির নাম Lilian (Airy, fairy Lilian)। রবীন্দ্রনাথ এর নাম দেন 'নলিনী'। অনুবাদটি ছাপা হয় ১২৮৬ সালের কার্তিক মাসের 'ভারতী'তে। লক্ষ করবার বিষয় এর ঠিক এক বছর পর অর্থাৎ ১২৮৭ সালের কার্তিক থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত 'ভগ্নহৃদয়' -এর প্রথম ছয় সর্গ 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ভাবগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই Tennyson -এর Lilian-এর অনুবাদ 'নলিনী'র সঙ্গে 'ভগ্নহৃদয়'-এর মূল চরিত্র নলিনীর অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে। আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের অনূদিত কবিতাটি সম্পূর্ণ তুলে দিলাম।

নলিনী

লীলাময়ী নলিনী,
চপলিনী নলিনী,
শুধালে আদর করে
ভালো সে কি বাসে মোরে,
কচি দুটি হাত দিয়ে
ধরে গলা জড়াইয়ে,
হেসে হেসে একেবারে
ঢলে পড়ে পাগলিনী!
ভালোবাসে কিনা, তবু
বলিতে চাহেনা কভু
নিরদয়া নলিনী!
যবে হৃদি তার কাছে,
প্রেমের নিঃশ্বাস যাচে
চায় সে এমন করে
বিপাকে ফেলিতে মোরে

হাসে কত, কথা তবু কয় না!

এমন নির্দোষ ধূর্ত

চতুর সরল,

ঘোমটা তুলিয়া চায়

চাহনি চপল

উজল অসিত - তারা- নয়না!

অমনি চকিত এক হাসির ছটায়

ললিত কপোলে তার গোলাপ ফুটায়,

তখনি পালায় আর রয় না।''

Tennyson -এর এই কবিতায় একটি নারী চরিত্র রয়েছে, যার রবীন্দ্র অনূদিত নাম নলিনী। সে 'লীলাময়ী', 'চপলিনী', 'নিরদয়া'। ভালোবাসে কিনা জিজ্ঞাসা করলে কচিহাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে, হেসে ঢলে পড়ে কিন্তু ''ভালোবাসে কিনা, তবু / বলিতে চাহেনা কভু।'' কবির কাছে তাই সে 'নিরদয়া'। Tennyson -এর এই নলিনীর (Lilian)-এর সঙ্গে আমরা 'ভগ্নহৃদয়'-এর নলিনীর সাদৃশ্য খুঁজে পাই। 'ভগ্নহৃদয়'-এর নলিনী সম্পর্কে অশোক যে মন্তব্য করেছে তা যেন Tennyson-এর নলিনীর কথাই স্মরণ করায়। অশোক বলেছে, ''কপট রমণী এক, অধম, চপল,/ নির্দ্দয়, হৃদয়হীন...'' (পঞ্চম সর্গ)। নলিনী সম্পর্কে চপলার মন্তব্য, ''পাষাণ হতেও মন তার সুকঠোর'' (অষ্টম সর্গ)। সে আরও বলেছে—

শুনেছি সে জ্যোতি আলেয়ার চেয়ে

কপট, চপল নাকি —

পথিকের পথ ভুলাবারি তরে

জ্বলি উঠে থাকি থাকি! (ঐ)

চপলা আরও শুনেছে—

শুনেছি সে বালা সারাটি জীবন

চড়িয়া পাষাণ রথে

চাকায় দলিয়া চলিবারে চায়

হৃদয় বিছানো পথে! (ঐ)

Tennyson-এর নলিনীও লীলাময়ী হৃদয়ের কারবারী। প্রেমিকের অন্তরে প্রেম তৃষ্ণা উস্‌কে দিয়ে পালিয়ে

যায়। আমাদের মতে তাই দুই নলিনী একই গোত্রের। Tennyson -এর Lilian কবিতার ছায়া 'ভগ্নহৃদয়'-এর নলিনীর মধ্যে পড়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয় ও রুদ্রচন্ড

'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়' ও' রুদ্রচন্ড' -এর মধ্যে আমরা কিছু সাদৃশ্য দেখতে পারি। প্রতিটি কাহিনীর মধ্যে রয়েছে একটি করে কবি চরিত্র। 'বনফুল'-এর নীরোদ একজন কবি, 'কবি কাহিনী' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন কবিরই কাহিনী। 'ভগ্নহৃদয়'-এ একজন কবি আছেন আর রুদ্রচন্ড'-এ আছেন চাঁদকবি। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়'-এর তিনটি কবি চরিত্র একই গোত্রের। এরা নি:সঙ্গ, একাকী, হৃদয়গত যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত। ' রুদ্রচন্ড'-এর চাঁদকবি এই তিনজনের থেকে স্বতন্ত্র। এছাড়া এ কাহিনীগুলির প্রতিটি পাত্র-পাত্রীই বিষণ্নতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, ''বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয় ও রুদ্রচন্ড সবই একছাঁচে ঢালা; সবগুলি তপ্ত উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত। প্রায় সকলগুলিরই নায়ক একজন কবি।''[২৮] সুখহীন, শান্তিহীন এক হৃদয়গত সমস্যার জটাজালে সবাই জড়িয়ে। 'বনফুল'-এর কবি নীরদ, 'কবিকাহিনী'র কবি এবং 'ভগ্নহৃদয়'-এর কবির বিষণ্নতার স্বরূপ একই রকম। এদের নিজেদের কাছে পরিষ্কার নয় কেন তাদের অন্তরে এত বিষণ্নতা। তারা স্পষ্টভাবে জানেনা তারা কি চায়। নীরদ সম্পর্কে কমলা প্রশ্ন করেছিল ''কিসের লাগিয়া/ মরমে মরিয়া করিছে এমন খেদের গান?'' এই প্রশ্ন এই তিন কবি চরিত্র সম্পর্কেই প্রযোজ্য। 'বনফুল' থেকে 'ভগ্নহৃদয়' পর্যন্ত কবি চরিত্র তিনটির আমরা কোন বিবর্তন দেখি না। কাহিনীর মধ্যেও যেমন রয়েছে সাদৃশ্য তেমনি কবি চরিত্রও তিনজন না হয়ে যেন একজন। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়' থেকে 'রুদ্রচন্ড' কিছুপরিমান স্বতন্ত্র। এখানে রবীন্দ্রনাথ হৃদয়গত ভাবোচ্ছ্বাসের গদগদ্ ভাব থেকে সরে এসে ইতিহাস ও কল্পনার মিশেলে কাহিনী রচনা করলেন। প্রেমের চরিত্রও গেল বদলে। নর-নারীর হৃদয়গত প্রেম রূপান্তরিত হ'ল ভাই-বোনের স্নিগ্ধ ভালবাসায়। কিন্তু এরও আভাস আমরা এর পূর্বে ' ভগ্নহৃদয়'-এর অনিল ও মুরলার মাঝে পেয়ে গেছি। এই সরে আসা সম্ভব হয়না পুরোপুরি ভাবে। কাহিনী ইতিহাসকে আশ্রয় করলেও ''তপ্ত উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত।।''[২৯] চাঁদকবি অন্যান্য কাহিনীকাব্যের কবি চরিত্র থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। চাঁদ কল্পনা বিলাসী নয়। সে পৃথ্বীরাজের সভাসদ। মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক পৃথ্বীরাজ আক্রান্ত হলে চাঁদকবি যুদ্ধে যায়। যুদ্ধে যোগদান করাকেই সে আপন কর্তব্য বলে জ্ঞান করে। আবার অমিয়ার জন্য রুদ্রচন্ডের সঙ্গে লড়াই করতে পিছপা হয়না। এখানেই চাঁদকবির সঙ্গে অন্যান্য কবি চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু

তবুও চাঁদ পূর্ববর্তী কবি চরিত্র গুলি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি। একজায়গায় তারা মিলে যায়, সে জায়গাটি হচ্ছে তাদের একাকিত্ব। শেষ পর্যন্ত এরা সবাই একা, নিঃসঙ্গ। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর চাঁদ কবি হয়ে পড়ে একা , তাকে বলতে হয় , ''ভ্রমিব সন্ন্যাসীবেসে শ্মশানে শ্মশানে'' (ত্রয়োদশ দৃশ্য) এবং অমিয়ার মৃত্যুর পর চাঁদকবির একাকিত্ব আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়' এবং' রুদ্রচন্ড'-এর নারী চরিত্র গুলির মধ্যেও সাদৃশ্য রয়েছে। কবি চরিত্রের মত এরাও নিঃসঙ্গ। 'বনফুল'-এর কমলা বিজয়ের স্ত্রী হওয়ার পরও নীরদকে সে ভালবাসে। কারণ ''বিবাহ কাহারে বলে'', ''কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী'' তার জানা নেই । সে জানে ''এত পাপ নয় বিধি! পাপ কেন হবে?/ বিবাহ করেছি বলে নীরদে আমার/ ভালবাসিব না?'' কিন্তু কমলা নীরদের ভালবাসা পায় না। বিজয় নীরদকে হত্যা করে। কমলা হয়ে পড়ে একা। 'মর্মদ্বার' খুলবার মূল্য তাকে দিতে হয় মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। যন্ত্রণার আগুনে পুড়তে পুড়তে, একা হতে হতে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মধ্যে কমলার মুক্তি লাভ ঘটে। 'কবি কাহিনীর'র কবিকে নলিনী ভালবাসা দিয়ে আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু নলিনীর ভালবাসা পেয়েও কবির প্রাণের শূন্যতা পুরণ হয়নি। কবি শান্তির অন্বেষায় নলিনীকে পরিত্যাগ করে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। নলিনী পড়ে থাকে একা। কবির প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে একদিন নলিনী মৃত্যুবরণ করে। 'ভগ্নহৃদয়'-এর নলিনীও ''হৃদয়ের দুয়ারের বাহিরে'' বসে প্রণয়ের খেলা খেলতে খেলতে একসময় একা হয়ে পড়ে। মুরলা কবির ভালবাসা না পেয়ে সংসার ত্যাগ করে। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তার হৃদয়গত যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি ঘটে। অনিলের সঙ্গে ললিতার বিয়ে হলেও ললিতা পায় না অনিলের ভালবাসা। একাকিত্বের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তারও জীবনের বেদনা বিধুর পরিসমাপ্তি ঘটে। নিঃসঙ্গতার শ্রোতধারায় 'রুদ্রচন্ড'-এর অমিয়াও রেহাই পায় না। পিতৃস্নেহ বঞ্চিত অমিয়ার মনে হয়েছিল '' আঁধার ভ্রূকুটিময় এই কানন'', মনে হয়েছিল ''শাসন—শকুনি এক দিনরাত্রি যেন/ মাথার উপরে আছে পাখা বিছাইয়া'', এর থেকে মুক্তির প্রয়োজন। তাই মনের আকাঙ্ক্ষা ''পাখী যদি হইতাম'', তা হলে 'সুনীল আকাশে' 'ঊষার আলোকে' প্রাণ ভরে সাঁতার দেওয়া যেত। বিষাদের অন্ধকারে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় আবর্তিত অমিয়ার মুক্তি লাভ ঘটে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

'বনফুল' থেকে 'রুদ্রচন্ড' পর্যন্ত ভাবগত যে ঐক্য রয়েছে সেই ঐক্য বিষাদময়তায়। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' এবং 'ভগ্নহৃদয়'-এর কাহিনী মর্তের কর্কশতা ছেড়ে ডানা মেলে উড়ে গেছে কল্পনার আকাশে। 'রুদ্রচন্ড'-এর কাহিনী ইতিহাস এবং কল্পনার মিশেলে মর্তের মাটি স্পর্শ করতে চাইছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের ডানা মেলার অভ্যাস এ কাহিনীতেও এসে আশ্রয় নিয়েছে চাঁদকবি ও অমিয়ার মাঝে। একারণেই 'রুদ্রচন্ড' কাহিনী কাব্যগুলি থেকে স্বতন্ত্র হ'তে গিয়েও রসগত বিচারে তাদের সমগোত্র হ'য়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'রুদ্রচন্ড'-এ মানসিক উত্তরণ অথবা মানবিক উত্তরণের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা এই পর্বের প্রতিটি কাহিনী কাব্যেই এই মানসিকউত্তরণের বীজ খুঁজে পেয়েছি। আমাদের মনে হয়েছে এই উত্তরণ রবীন্দ্রনাট্যে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যদিও এই পর্বে মানবিক উত্তরণ অপেক্ষা অন্য কিছুর জন্য অনিবার্য তৃষ্ণা চরিত্র গুলির মধ্যে বেশি প্রকটিত কিন্তু তবুও এই অনিবার্য তৃষ্ণায় মানবিকতারই অনুষঙ্গ প্রকাশ পায়। এই উত্তরণ কোন দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয় না, শুধু এক মানবিকতারই উন্মেষ মাত্র। আমরা এই উন্মেষের ধারাবাহিকতার বীজ অনুসন্ধান করেছি কাহিনীকাব্য 'বনফুল' থেকে। প্রকৃতি কন্যা কমলা মানুষ, সংসার কাকে বলে জানতো না কিন্তু সেও এক সময় বলে—

এখন মানুষে বেসেছি ভালো
হৃদয় খুলি মানুষ কাছে।

'কবিকাহিনী'র কবি স্পষ্টতই ঘোষণা করে ''মানুষের মন চায় মানুষেরই মন।'' মানুষের জন্য কল্যাণময় রাষ্ট্রের কল্পনার মধ্যদিয়েই তার মানবিকতার উন্মেষ ঘটে। তার কামনা—

অযুত মানবগণ এককণ্ঠে ,দেব,
একগান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণকরি!

'ভগ্নহৃদয়'- এর প্রতিটি চরিত্রই শেষ পর্যন্ত নিজ নিজ অবস্থান চিহ্নিত করার মধ্যদিয়ে খুঁজে নেয় উত্তরণের পথ। কবি খুঁজে নেয় মুরলাকে, অনিল খুঁজে নেয় ললিতাকে আর নলিনী 'হৃদয়ের দুয়ারের' বাইরে বসে প্রেমের খেলা পরিত্যাগ করে, অনুতাপে দগ্ধ হ'তে হ'তে সত্যিকার ভালবাসার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। এই উন্মুখতা আমাদের বিবেচনায় মানসিক উত্তরণেরই বহি:প্রকাশ। ' রুদ্রচন্ড'-এ পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে রুদ্রচন্ডের প্রতিশোধ স্পৃহার মৃত্যু ঘটে এবং ঘটে মানসিক উত্তরণ।

'ভগ্নহৃদয়' কি নাটক ? এই বিষয়টির মীমাংসার প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ''বিলেতে আর একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল।''[৬০] অথবা ''এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন।''[৬১] কিন্তু কেন এই সাবধান বাণী ? রবীন্দ্রনাথ কি একখানি নাটক রচনা করারই চেষ্টা করেছিলেন? যা শেষ পর্যন্ত কাঠামোগত ভাবে নাটক হয়ে পড়ে সত্যি কিন্তু ভাবগতভাবে রয়ে যায় পূর্ববর্তী কাহিনী কাব্যগুলোর মতোই আবেগ-ঘন? আমরা এমনটাই ধারণা করে নিতে পারি।

ফুলের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ নাটককে ফুলের গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে গাছ ''মূল,কান্ড, শাখা, পত্র এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত'' [৬২] সঙ্গে করে ফুল ফোঁটায় সেই ফুলের গাছই হচ্ছে নাটক। কিন্তু 'ভগ্নহৃদয়' শুধুমাত্র ফুল। সম্পূর্ণ একটি গাছকে সংগ্রহ না করে শুধুমাত্র একটি মালাগাঁথবার জন্য

"কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে।" কিন্তু ফুল গাছ থেকে বিযুক্ত করে নিলেও সে তো গাছেরই অংশ এবং পূর্ণাঙ্গতার একটি অংশ আর এই অংশে আমরা পূর্ণাঙ্গতার সামান্য আভাস নিশ্চয়ই লাভ করতে পারি। শ্রী প্রমথনাথ বিশী 'ভগ্নহৃদয়' প্রসঙ্গে লিখেছেন,"নাটক ও গীতিকবিতার সীমান্ত প্রদেশের রচনা ভগ্নহৃদয়; তাহার খানিকটা নাটকী য়, খানিকটা কাব্যীয়; বহির্লক্ষণ নাটকের, অন্তর্লক্ষণ কাব্যের;... কাহিনী-কাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যের মিশ্র প্রভাবে ভগ্নহৃদয় সৃষ্টি। ইহা রবীন্দ্র কাব্যের তেমাথার মোড়।"[৩৪] এই মিশ্র রূপায়ণের কারণে রবীন্দ্র রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খন্ডের গ্রন্থ পরিচয় অংশে একে 'বিচিত্র নাট্যকাব্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অশ্রুকুমার সিকদারের মতে, "ভগ্নহৃদয় বস্তুত নাট্যাকারে লিখিত কাব্য।"[৩৫] একই কথা বলেছেন ড: সুশীলকুমার গুপ্ত, " বাহ্যিক রূপে ভগ্নহৃদয়কে নাটক রূপে ভ্রম হলেও অন্তর রূপের বিচারে এটিকে নাটকাকারে কাব্য বা নাট্যকাব্য বলা উচিত।"[৩৬] সুতরাং এসব কিছু মিলিয়ে আমরা 'ভগ্নহৃদয়' কে নাট্যরূপাপন্ন কাব্য বলে চিহ্নিত করতে পারি। সংস্কৃ ত নাটক যেমন দৃশ্যকাব্য রবীন্দ্রনাথ যেন এখানে নিজেরও অজ্ঞাতে নাটক আর কাব্যের ভেদ মুছে দিতে চেয়েছেন।

'ভগ্নহৃদয়'-এ পাত্র-পাত্রীর পরিচয় প্রদান করা হয়েছে নাটকের মত করে। প্রথম দু'টি কাহিনী কাব্যের ধারায় ('বনফুল', 'কবিকাহিনী') 'সর্গ' উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নতুন সংযোজন হয়েছে দৃশ্য বর্ণনা। যেমন - প্রথম সর্গ / দৃশ্য—বন। চপলা ও মুরলা , অথবা দ্বিতীয় সর্গ/ ক্রীড়া কানন। নলিনী ও সখীগণ। এই সংযোজন নাট্যকাঠামোর আভাস দিয়ে নাটক রচনার দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়াকেই বোঝায়। পাত্র-পাত্রীদের সংলাপের মধ্যেও নাট্যলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

চারু। তোর সাজ ফুরাইবে কবে?

লীনা। সখি, আবার কিসের সাজ!

সুরুচি। দেখ, এসেছে হইয়া সাঁঝ! (দ্বিতীয় সর্গ)

বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশ প্রদানও আঙ্গিকগত ভাবে নাটকের আভাস দিয়ে যায়। যেমন—

দামিনী। (হাসিয়া) এসেছে বিনোদ!

লীলা। (হাসিয়া) এসেছে প্রমোদ!

বিনো। (হাসিয়া) এসেছে সেথা অশোক!

মাধবী। (হাসিয়া) এসেছে বিজয়!

চারু। (চিবুক ধরিয়া) সুরেশ রয়েছে

পথ চেয়ে তোর তরে! (দ্বিতীয় সর্গ)

শ্রী ভূদেব চৌধুরী কবিতা ও নাটকের পার্থক্য উল্লেখ করে 'ভগ্নহৃদয়'—এর অবস্থান চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, ''কবিতা ও নাটক নির্বিশেষে সাহিত্য মাত্রই বাস্তব জীবন-সম্ভব; কিন্তু নাটকের রস-স্ফুরণ ঘটে বস্তু-সংঘাত-মন্থনে; অন্য পক্ষে কবিতার বিকাশ বস্তু-সার-সুর ভির সংকলনে।''[৩৭] 'ভগ্নহৃদয়'-এ এই 'বস্তু-সংঘাত-মন্থনের' কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে শ্রী ভূদেব চৌধুরী আরও লিখেছেন, '' 'ভগ্নহৃদয়ে' নাটকীয় পাত্রপাত্রীর সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে প্রচুরতর, তাদের অনুভূতিতে স্বাতন্ত্র্য এবং ক্রমপরিণতির সংকেতও অস্ফুট নয়; তবু জীবনের বাস্তবিক সংঘাতের পূর্ণায়ত রূপ-রেখা দূরতম আভাসেও তাতে ধরা পড়েনি।''[৩৮] কিন্তু তার পরও 'ভগ্নহৃদয়' নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার সূচনার সূচনা, ''সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো।''[৩৯]

আমরা নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার সূত্রপাতের স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' হয়ে 'ভগ্নহৃদয়'-এ পৌঁছেছি। এরই সূত্র ধরে আমরা বিচার করতে চাই পূর্ববর্তী কাহিনী কাব্যগুলি থেকে 'রুদ্রচন্ড' কতটুকু সরে এসে নাটক হিসেবে দাঁড়াতে পেরেছে। 'রুদ্রচন্ড' প্রকাশিত হওয়ার পর মাসিক বান্ধব পত্রিকায় এর একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে লেখা হয়েছিল, ''তাঁহার সমগ্র কবিতাতেই একটুকু অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ নূতনত্ব আছে। রুদ্রচন্ডের রচনাতেও সেই নূতনত্ব স্পষ্টত পরিলক্ষিত হইতেছে। কবিতাগুলি যেন আধ আধ ভাঙ্গা গলায় নিরবিচ্ছিন্ন মধু ঢালিতেছে। কিন্তু নাটকাংশে ইহা অসম্পূর্ণ।''[৪০] আসলে 'রুদ্রচন্ড' নাটক তৈরীর আদিরূপ। তাই এখানে নেই কোন জটিল নাট্যকৌশল। কাহিনী সরল এবং একমুখী। কাহিনীতে রয়েছে ইতিহাসের ছায়া। ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করার কারণে কাহিনীর শরীর থেকে কিছু পরিমান ভাবালুতা ঝরে পড়েছে। পূর্ববর্তী কাহিনী কাব্যগুলির কাল্পনিকতার আকাশচারী প্রবণতা থেকে ঈষৎ সরে এসে 'বস্তু-সংঘাত-মন্থনের' ক্ষেত্রে সামান্য প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। একারণেই কবি চরিত্রটি হয়েছে স্বতন্ত্র। রুদ্রচন্ডের ভিতরে দেখা যাচ্ছে সংঘাত (conflict)। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ''কাঁচা লেখা হইলেও এরই মধ্যে সর্বপ্রথম নাটকীয়তার সমারোহ দেখা গেল।''[৪১] আমাদের মতে 'নাটকীয়তার সমারোহ' ব্যাপক অর্থে ধরা পড়েনি, তার আভাস রয়েছে মাত্র। নাটক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যে দুটো জিনিস অপরিহার্য গতিবেগ (action) এবং সংঘাত (conflict) তার আভাস আমরা লাভ করতে পারি 'রুদ্রচন্ড'-এ। যেমন নাটকের অষ্টম দৃশ্য এবং একাদশ দৃশ্যে গতিশীলতার আভাস আমরা চকিতে পেয়ে যাই কিন্তু সমগ্র নাটকে সংঘাত ময়তার মধ্যদিয়ে গতিবেগের অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের ব্যর্থ হ'তে হবে। রুদ্রচন্ডের ভিতরে দীর্ঘদিনের লালিত আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণকরার চেষ্টা অথবা পূর্ণ না হওয়া এই দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত রুদ্রচন্ড অনেক বেশি জীবন্ত। জীবনকৃষ্ণ শেঠ রুদ্রচন্ডের চরিত্রের মধ্যে পৌরুষ লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, '' 'রুদ্রচন্ড'

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিশোধমূলক নাটক (Revenge Drama)। **তিনি এর মধ্যে সেকস্‌পীয়র** পড়েছেন। এনাটক তার অক্ষম অনুকরণ। কিন্তু চন্ডের চরিত্রে যে পৌরুষ লক্ষ করা যায় তা রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি।''[৪২] রবীন্দ্রনাটকে এই পৌরুষ পরবর্তী পর্যায়ে আমরা 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতির মধ্যেও লক্ষ করি। আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে ড: সুশীলকুমার গুপ্ত এবং প্রশান্তকুমার পালের লেখায়। ড: সুশীলকুমার গুপ্ত লিখেছেন, '' 'বিসর্জন' নাটকে প্রতিশোধ তৃষ্ণা মিটাবার জন্য অহংকারোদ্ধত রঘুপতিও একদিন গোবিন্দমানিক্যের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন, রুদ্রচন্ডের মধ্যে রঘুপতির পূর্বাভাস দেখা যায়।''[৪৩] প্রশান্তকুমার পালও একই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জানাচ্ছেন, ''বিসর্জন-এর রঘুপতির সঙ্গে রুদ্রচন্ডের অধিকতর সাদৃশ্য দেখতে পাই।''[৪৪] চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এই দুটি চরিত্র কাছাকাছি। দু'জনেই একরোখা, জেদি। একজন রাজ্য হারিয়ে প্রতিশোধ স্পৃহায় অন্ধ অন্যজন ক্ষমতা হারিয়ে উন্মত্ত। দুটি চরিত্রের মধ্যে আবার ভিন্নতাও লক্ষিত হয়। রুদ্রচন্ড পৃথ্বীরাজকে হত্যা করার জন্য কোন ধরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়নি। নিজ হাতে সে পৃথ্বীরাজকে হত্যা করবে এই ছিল তার বাসনা। এই কারণে সে মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে কোন রকম সন্ধি করতে রাজী হয়নি, কিন্তু রঘুপতি গোবিন্দমানিক্যকে হত্যা করার জন্য নক্ষত্র রায়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এবং নক্ষত্র রায়কে উদ্বুদ্ধ করেছে নিজ ভাইকে হত্যা করার জন্য। এই দুটি চরিত্রের পরিণতির দিক থেকে সামান্য পরিমান সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে রুদ্রচন্ডের সংকল্পের অবসান ঘটে। আত্মঘাতী হওয়ার মুহূর্তে প্রতিশোধ স্পৃহার অন্ধকারে তলিয়ে থাকা পিতা রুদ্রচন্ডের নিষ্ক্রমণ ঘটে, কন্যাকে ভালবেসে উত্তরণ ঘটে। রঘুপতিরও উত্তরণ সাধিত হয় একটি মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সে মৃত্যুটি হচ্ছে তার প্রাণপ্রিয় , সন্তানসম শিষ্য জয়সিংহের।

আমাদের মতে 'রুদ্রচন্ড', 'রাজা ও রানী' ও 'বিসর্জন'-এর মধ্যে একটি সাধর্ম্য রয়েছে। 'রুদ্রচন্ড'-এর রুদ্রচন্ড , 'রাজা ও রানী'র বিক্রমদেব এবং 'বিসর্জন'-এর রঘুপতি প্রকৃতিগত দিক থেকে একই রকমের। রুদ্রচন্ড তার রাজ্য থেকে স্থানচ্যুত হয়ে ক্রোধে অন্ধ, বিক্রমদেব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে রাণীর কাছ থেকে তাই প্রেম পরিণত হয়েছে প্রতিহিংসায় এবং রঘুপতিও রাজার আদেশে অধিকারচ্যুত হওয়ার কারণে ক্রোধোন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে। তিনটি চরিত্রই কোন কিছু হারিয়ে প্রতিশোধ-স্পৃহার অনলে জ্বলছে। আবার কাহিনীর শেষে এসে তিন জনের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর স্ফুরণ ঘটেছে। মানসিক উত্তরণ ঘটেছে। সবগুলিতে প্রতিহিংসার উপরে প্রেমের জয় বর্ণিত হয়েছে। সুমিত্রার মৃত্যুজনিত আঘাতের ফলেই বিক্রমদেবের প্রতিশোধ স্পৃহার অনল থেকে নিষ্ক্রমণ ঘটেছে। অনুশোচনায় দগ্ধ হ'তে হ'তে বিক্রমদেব উচ্চারণ করেছে —

দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের
তাই বলে মার্জনাও করিলেনা? রেখে
গেলে চির-অপরাধী করে? ইহ জন্ম নিত্য
অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমাতব; তাহারও দিলে না অবকাশ?
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দন্ড, কঠিন বিধান। (পঞ্চম অঙ্ক/ নবম দৃশ্য)

এই তিনটি নাটকে মৃত্যুজনিত কারণের দ্বারাই তিনটি প্রধান চরিত্রের অন্ধকার থেকে নিষ্ক্রমণ ঘটেছে। তবে 'বিসর্জন' - এ জয়সিংহের মৃত্যু এবং 'রাজা ও রানী' তে সুমিত্রার মৃত্যু প্রকৃতিগত দিক থেকে এক রকম হলেও 'রুদ্রচন্ড'-এ পৃথ্বীরাজের মৃত্যু আলাদা রকমের। সেক্সপীয়ার পাঠের ফলশ্রুতি হিসাবে 'Revenge Drama'-র যে ছায়া জীবনকৃষ্ণ শেঠ 'রুদ্রচন্ড'-এ প্রত্যক্ষ করেছেন সেই ছায়াই আমাদের মতে প্রলম্বিত হয়েছে 'রাজা ও রানী' হয়ে 'বিসর্জন'-এ।

'রুদ্রচন্ড' পূর্ববর্তী কাহিনী কাব্যের ধারাবাহিকতা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেনি। Edward Thompson একে বলেছেন, "The piece is poor melodrama." কিন্তু তারপরও নাট্যকাব্যের বীজ কিছু পরিমাণে আমরা 'রুদ্রচন্ডে'- এ খুঁজে পাই। সংঘমিত্রা বন্দোপাধ্যায়ের মতে, "এই করুণ রসের মধ্যদিয়েই নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।... আসলে নাটকটিতে নাটকের আঙ্গিকগত দুর্বলতা কিছু কিছু রয়ে গেছে। তৎকালীন কাব্যগুলির ভাষাগত প্রবণতা নাটকটিতে মাঝে মাঝেই দেখা যায়।... আঙ্গিকের দিক থেকে তা স্বভাবতই 'অপরিণত' ও অসম্পূর্ণ কিন্তু ভাবের দিক থেকে নাটকটি তাঁর পরিণত চিন্তাধারারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ বলে পরিগণিত হবার যোগ্য।" রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারার নাটকের বীজ 'রুদ্রচন্ড'-এ কতটুকু রয়েছে সে বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। এ পর্যায়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই যে 'রুদ্রচন্ড'- এর নাট্যদাবী একেবারে বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়।

খ. বাল্মীকি প্রতিভা

অভিনয়ের প্রয়োজনে রচিত হ'ল 'বাল্মীকি প্রতিভা'। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়েছিল। এই সভায় অভিনয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন

'বাল্মীকি প্রতিভা'। অভিনয়ের তারিখ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, ''বিদ্বজ্জন সমাগম-এ বাল্মীকি প্রতিভা প্রথম অভিনীত হয় শিবরাত্রির দিন ১৬ ফাল্গুন ১২৮৭ শনিবার (26 Feb 1881) - এ''।[৪৮] তবে 'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রকাশিত হয় অভিনয়ের কিছুদিন আগে। এ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন ''বাল্মীকি প্রতিভা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৮০২ শক (১২৮৭) - এ; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় প্রকাশের তারিখ 12 Feb 1881 (শনি ২ ফাল্গুন)...।''[৪৯]

'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনার আগে রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত গিয়েছিলেন এবং ১৮৮০ সালে বিলেত থেকে ফিরে আসেন । এর এক বছর পর রচিত হয় 'বাল্মীকি প্রতিভা'। আর এই রচনায় আপতিত হয় বিলেত বাসের অভিজ্ঞতার ছায়া। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমরা জেনে নিতে চাই 'বাল্মীকি প্রতিভা'র কাহিনী বিন্যাস।

রামায়ণের কাহিনী থেকে রবীন্দ্রনাথ গেঁথে তুলেছেন 'বাল্মীকি প্রতিভা'। তবে এর রচনার পিছনে বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদা মঙ্গল' কাব্যের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ''তখন বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল সংগীত আর্যদর্শনে বাহির হইতেছিল এবং আমরা তাহাই লইয়া মাতিয়াছিলাম। এই সারদা মঙ্গলের আরম্ভ সর্গ হইতেই বাল্মীকি প্রতিভার ভাবটা আমার মাথায় আসে এবং সারদামঙ্গলের দু'একটি কবিতাও রূপান্তরিত অবস্থায় বাল্মীকি প্রতিভায় গান রূপে স্থান পাইয়াছে।''[৫০]

'সারদা মঙ্গল'-এর আরম্ভ সর্গ থেকে যে ভাবটি মাথায় এল সেই ভাবকেই রবীন্দ্রনাথ ছয়টি দৃশ্যে লিপিবদ্ধ করলেন। প্রথম দৃশ্যে বনদেবীগণের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে—

সহেনা সহেনা কাঁদে পরাণ।
সাধের অরণ্য হল শ্মশান।
দস্যুদলে আসি শান্তি করে নাশ,
ত্রাসে সকল দিক কম্পমান।

এই দস্যুদলের দলপতি বাল্মীকি। বাল্মীকি কালী উপাসক।

ত্রিভুবন - মাঝে আমরা সকলে কাহারে করিনা ভয় -
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়। (প্রথম দৃশ্য)

এই কালী পূজার জন্য বাল্মীকি অন্যান্য দস্যুদের আদেশ দিলেন, ''সবে মিলি তোরা / বলি নিয়ে আয়।''।

দস্যুরা পূজার বলির জন্য এক বালিকাকে ধরে নিয়ে আসে, যে বালিকা অরণ্যে পথ হারিয়ে ঘুরছিল। এসময় বনদেবীরা গেয়ে ওঠে—

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়।
আহা ওই করুণ চোখে ও কার পানে চায়!
বাঁধা কঠিন পাশে,অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি জলে ভাসে, এ কী দশা হায়!
এ বনে কে আছে, যাব কার কাছে, কে ওরে বাঁচায়। (প্রথম দৃশ্য)

দ্বিতীয় দৃশ্যে কালীপ্রতিমার সামনে বাল্মীকি স্তবে আসীন। দস্যুরা বালিকাকে বাল্মীকির সামনে নিয়ে আসে। বাল্মীকি দস্যুদের আদেশ করে, 'নিয়ে আয় কৃপাণ...' বাল্মীকির এই কথা শুনে বালিকা বলে ওঠে, "পথহারা একাকিনী বনে অসহায় -/ রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমায়!" নেপথ্য থেকে বনদেবীগণ গেয়ে ওঠে—

"দয়া করো অনাথেরে দয়া কর গো—"

বালিকার এই কাতর আকৃতি এবং বনদেবীগণের মিনতিতে বাল্মীকির 'পাষাণ হৃদয়' গলে যায়। বাল্মীকির মনে করুণার জাগরণ ঘটে। বাল্মীকি বলে ওঠে—

এ কেমন হল মন আমার!
কী ভাব এযে কিছুই বুঝিতে যে পারিনে—
পাষাণ হৃদয়ও গলিল কেন রে,
কেন আজি আঁখি জল দেখা দিল নয়নে!
কী মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো, সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে।

বালিকার কাতর আকূতির কারণে বাল্মীকির হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে যায়। বাল্মীকি এই পরিবর্তনে বিস্মিত। এমনতো হওয়ার কথা ছিল না। পাষাণ হৃদয়ও যে গলে যেতে পারে, মরুভূমিও যে করুণার রসে সিক্ত হতে পারে তা বাল্মীকি এতদিন উপলব্ধি করতে পারেনি। ক্ষণিকের একটি ঘটনা সবকিছু আলোড়িত করে ফেলে। এতদিনের নিষ্ঠুরতার মাঝে নেমে আসে পেলবতার জলধারা। একারণেই বাল্মীকিকে আদেশ করতে হয়—

শোন্, তোরা শোন্ এ আদেশ
কৃপাণ খর্পর ফেলে দে দে!
বাঁধন কর্ ছিন্ন, মুক্ত কর্ এখনি রে।

এ বাঁধন শুধু বালিকারই ছিন্ন হয় না, দস্যুদের হাত থেকে শুধু বালিকাই মুক্তি লাভ করেনা পাশাপাশি দস্যুবৃত্তির নির্মমতার হাত থেকে বাল্মীকি নিজেই মুক্তি লাভ করে।

তৃতীয় দৃশ্যে বাল্মীকির মনের শূন্যতার কথা প্রকাশ পেয়েছে। 'ব্যাকুল হয়ে বনে বনে' বাল্মীকি একা শূন্যমনে ঘুরছে। বাল্মীকির এই হাহাকার কিসের জন্য? এতদিন যে কাঠিন্যের আবরণে তার হৃদয় পাষাণ হয়েছিল এই পাষাণ হৃদয় গলে যাওয়ার কারণে কি এই শূন্যতা? নাকি কোন কিছু হারিয়ে ফেলার কারণে? অথবা নিজের অভ্যস্তজীবন থেকে বিযুক্ত হওয়ার কারণে এই শূন্যতা? রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচনায় অনির্দেশ্য শূন্যতার ভাব প্রকট। এই অনুভূতির মূলে আছে কবির রোমান্টিক মনোভঙ্গি। জগৎ ও জীবনের বাস্তব সৌন্দর্য ও প্রেমে তাঁর মন তৃপ্তি পাচ্ছে না বলে একটা হতাশা ও শূন্যতার বোধ তাঁর মনে দেখা দিচ্ছে। রবীন্দ্র প্রতিভার যা সাধারণ ধর্ম নিত্যকার জীবনের অতিরিক্ত কোন সৌন্দর্য সন্ধান—সুদূর ও অপ্রাপনীয়ের যে বেদনা—তাই এসব শূন্যতার মূল। কালী বাল্মীকির এতদিনকার দেবী। আজ বাল্মীকির মনে করুণার নূতন ভাব এবং নূতন অনুভূতির জাগরণ ঘটেছে এবং এই জাগরণের ফলে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়েছে পূর্ববর্তী অভ্যস্তজীবনের সঙ্গে, একারণেই এই শূন্যতা। পাশাপাশি লক্ষ করা যাচ্ছে এই শূন্যতা পুরণের জন্য আকুলতা —

কে পুরাবে মোর কাতর প্রাণ,
জুড়াবে হিয়া সুধা বরিষণে।

এই দৃশ্যে দেখা যায় পুনরায় দস্যুরা বালিকাকে ধরে নিয়ে আসে। কিন্তু বাল্মীকি তো এখন আর এই বলি হতে দিতে পারে না। তাই সে বাধা দিয়ে বলে, "এসব কাজ আর না, এ পাপ আর না।" বাল্মীকির কাছে এখন পাপ-পুন্যের ধারণাটি পরিষ্কার। তার পাপ জগতের অন্ধকারে বালিকা এসে আলো জ্বেলে দিয়েছে। তাই বাল্মীকিকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে হয়, "এ পাপ আর না,/ আর না, আর না—ত্রাহি সব ছাড়িনু!" এই দৃশ্যের শেষে বালিকার উদ্দেশ্যে বাল্মীকি কে বলতে শোনা যাচ্ছে, "আয় মা আমার সাথে, কোন ভয় নাহি আর।" 'রুদ্রচন্ড' নাটকেও মৃত্যু পথযাত্রী রুদ্রচন্ড. এতদিন নিজ সন্তান অমিয়াকে যে অবহেলা করেছে, সেই সন্তানের উদ্দেশ্যে বলছে, "আয় মা অমিয়া মোর কাছে আয় বাছা" (দ্বাদশ দৃশ্য)। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে সন্ন্যাসী যে বালিকাকে এতদিন অবহেলা করেছে নাটকের শেষ দৃশ্যে এসে সেই বালিকার উদ্দেশ্যে

বলছে, ''স্নেহের প্রতিমা, ওগো, মা, আমি এসেছি/ ধুলায় পড়িয়া কেন,—ওঠ মা, ওঠ মা-'' (ষোড়শ দৃশ্য)। 'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহের মৃত্যুর পর রঘুপতিও অপর্ণাকে মা বলে সম্বোধন করছে, ''আয় মা অমৃতময়ী!'' (৫ম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)।

তৃতীয় দৃশ্যে 'এ পাপ আর না' বলে ঘোষণা দিলেও চতুর্থ দৃশ্যে প্রাণের কান্না থামানোর জন্য অথবা নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর জন্য বাল্মীকি কে দলবল নিয়ে শিকারে মেতে উঠতে দেখা যায়, ''ধরি ধনু আনি বান, গাহিব ব্যাধের গান,/ দলবল নিয়ে মাতিব।'' দস্যুবৃত্তি রূপান্তরিত হয় ব্যাধবৃত্তিতে। কিন্তু সেখানেও তো হত্যা রয়েছে, রয়েছে রক্তপাত। করুণার সঞ্চার যার অন্তরে হয়েছে সে তো আর রক্তপাত ঘটাতে পারে না। তাই বাল্মীকিকে বলতে হয়—

রাখ্ রাখ্, ফেল্ ধনু, ছাড়িস নে বাণ।
হরিণ শাবক দুটি প্রাণ ভয়ে ধায় ছুটি,
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান।
কোনো দোষ করে নি তো, সুকুমার কলেবর—
কেমনে কোমল দেহে বিঁধিব কঠিন শর!
থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দারুণ খেলা রাখ্,
আজ হতে বিসর্জিনু এ ছার ধনুক বাণ।

শ্রী বার্ণিক রায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, '' প্রাণ করুণার লীলা প্রত্যক্ষ করে সে দিনই ধনুকবাণ বিসর্জন করেছেন।''[৫১] 'বিহারী লাল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ যোগ্য, ''কবি যে সরস্বতীর বন্দনা করিতেছেন তিনি নানা আকারে নানা ভাবে নানা লোকের নিকট উদিত হন। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্য রূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এবং স্নেহ প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন।''[৫২] এই হরিণ শাবক দুটির মধ্যেও যেন সৌন্দর্য রূপে সেই সরস্বতী বিরাজিত। প্রথমবার বালিকার রূপ ধরে বাল্মীকির মধ্যে তিনি করুণার সঞ্চার করলেন। দ্বিতীয়বার দুটি হরিণ শাবকের রূপ ধরে তিনি সেই করুণাধারাকেই বেগবান করলেন এবং এই করুণার প্রবাহমানতায় ভেসে গিয়ে বাল্মীকি বিসর্জন দিলেন ধনুকবাণ, যে ধনুকবাণ শুধু রক্তাক্ত মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মানবতার পতন ঘটায়।

পঞ্চম দৃশ্যের শুরুতেই দেখা যায় ''জীবনের কিছু হলনা হায়''—বলে বাল্মীকিকে আক্ষেপ করতে। সহচর যারা ছিল সকলেই তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। এখন কোন কাজ নেই, ''কী করিব জানিনা

যে!'' এরপর ব্যাধগণের পাখি শিকার, বাল্মীকির নিষেধ এবং নিষেধ না মানার কারণে বাল্মীকির অজ্ঞাতসারে তার মুখ থেকে ''মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং...'' শ্লোক বেরিয়ে আসা। এই শ্লোক উচ্চারণ করে বাল্মীকি বিস্মিত হয়ে ওঠে—

কী বলিনু আমি! এ কী সুললিত বাণী রে!
কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিনু দেবভাষা,
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে!
পুলকে পুরিল মন প্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
এ কী! হৃদয়ে এ কী এ দেখি!--
ঘোর অন্ধকার-মাঝে, এ কী জ্যোতি ভায়!
অবাক্!—করুণা এ কার!

এর পর সরস্বতী আবির্ভূত হন। সরস্বতীর এই আবির্ভাবের মধ্যদিয়ে, ''ধন্য হল দস্যুপতি, গলিল পাষাণ।'' এই দৃশ্যের শেষে কালী প্রতিমার প্রতি বাল্মীকির সংলাপ বিশেষ তাৎপর্যময়—

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা!
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা!
এতদিন কি ছল করে তুই, পাষাণ করে রেখেছিলি—
আজ আপন মায়ের দেখা পেয়ে, নয়ন জলে গলেছি মা!
কালো দেখে ভুলিনে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন—
আমায় তুমি ছলেছিলে, এবার আমি তোমায় ছলেছি মা!
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা!

এই ছেড়ে আসার মধ্য দিয়েই বাল্মীকির পুরোপুরি উত্তরণ ঘটে যায়। এ উত্তরণ কালো থেকে আলোর দিকে, নিষ্ঠুরতা থেকে কারুণ্যে। আর এই উত্তরণের ফলে তার অন্তরে হঠাৎ জাগা শূন্যতাও গেল ঘুচে। উপরের সংলাপের সঙ্গে 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতির শেষ সংলাপের আমরা মিল খুঁজে পাই। প্রায় একই কথা রঘুপতি বলছে, ''পাষাণ ভাঙ্গিয়া গেল-জননী আমার/ এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!/ জননী অমৃতময়ী!'' (৫ম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)।

পঞ্চম দৃশ্যে হৃদয়ে যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটলো, শুভ্র জ্যোতির্ময় সরস্বতীর যে আবির্ভাব ঘটলো, ষষ্ঠ দৃশ্যে দেখা গেল বাল্মীকি তারই অনুসন্ধান করছে —

কোথা লুকাইলে !

সব আশা নিবিল, দশ দিশি অন্ধকার,

সবে গেছে চলে ত্যেজিয়ে আমারে -

তুমিও কি তেয়াগিলে !

এই দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে লক্ষ্মী এসে বাল্মীকিকে প্রলোভন দেখাচ্ছে, ''কমলা দিতেছে আসি, রতন রাশি রাশি,/ ফুটুক তবে হাসি মলিন মুখে।'' কিন্তু বাল্মীকি লক্ষ্মীর রাশি রাশি রতনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলছে, '' দেবী গো, চাহিনা, চাহিনা,মনিময় ধুলিরাশি চাহিনা।'' এই দৃশ্যের শেষে পুনরায় সরস্বতীর আবির্ভাব ঘটে। সরস্বতী বাল্মীকিকে জানায় যে, আমি দীন হীন বালিকা সেজে তোর পাষাণ হৃদয় গলাতে এসেছিলাম, 'আমি বীনাপাণি' তোকে গান শেখাতে এসেছি।

এই নে আমার বীনা, দিনু তোরে উপহার,

যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার।

বিহারীলালের 'সারদা মঙ্গল'-এর প্রথম সর্গের ভাব থেকে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র ভাবনা এলেও রবীন্দ্রনাথ দস্যু রত্নাকরের কবি বাল্মীকিতে উত্তরণের কাহিনীটি রামায়ণ থেকে সংগ্রহ করেছেন। যদিও 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় রত্নাকরের উল্লেখ নেই তবুও আমরা ধরে নেব এ দস্যু রত্নাকরেরই কাহিনী। 'বাল্মীকি প্রতিভা'তে আমরা দু'জন বাল্মীকির সন্ধান পাই। একজন দস্যু বাল্মীকি আরেকজন কবি বাল্মীকি। রামায়ণ থেকে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র কাহিনী প্রসঙ্গে শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাল্মীকি প্রতিভায়' বাল্মীকি রচিত মূল রামায়ণ অনুসরণ করেন নি। তিনি অনুসরণ করেছেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ। সে জন্য বাল্মীকিকে দস্যু নায়ক রূপে বর্ণনা করেছেন।... এখানে রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত দস্যু বাল্মীকির কবি বাল্মীকিতে রূপান্তরের ঘটনাকে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে রত্নাকর দস্যু হলেও কালীপূজক নয়।... কৃত্তিবাস রত্নাকর দস্যুর যে বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন বাল্মীকি রামায়ণে তা পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাস এ কাহিনী কোথা থেকে পেলেন? ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্ভূক্ত বলে স্বীকৃত 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ আছে। সেখানে কৃত্তিবাস কথিত 'চ্যবন ঋষির পুত্র নাম রত্নাকর' নেই। সেখানে ঋষি বাল্মীকি স্বমুখে পূর্বজীবন বৃত্তান্ত রামচন্দ্রের কাছে বর্ণনা করেছেন।''[৫১] কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র কাহিনী গৃহীত হলেও কালী উপাসক হিসেবে বাল্মীকির রূপদান পুরোপুরি ভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসারে বাল্মীকিকে দস্যু হিসেবে উপস্থাপন করা হ'ল ঠিকই কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাল্মীকি কালী উপাসক নয়। তবে কেন রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিকে কালী উপাসক হিসেবে রূপদান করলেন? দস্যুরা সাধারণত কালী উপাসক হয়ে থাকে এই বিবেচনা থেকেই হয়তো

রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিকে কালী উপাসক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

'বিসর্জন' নাটকের সঙ্গে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র দুটি জায়গাতে সাদৃশ্য রয়েছে বলে আমাদের ধারনা। প্রথমত 'বিসর্জন' নাটকে কালী প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যদিয়ে রঘুপতি যেমন মিথ্যা বিশ্বাসকে বিসর্জিত করে সত্যের পথে বেরিয়ে আসে তেমনি 'বাল্মীকি প্রতিভা'তেও বাল্মীকি কালী প্রতিমার প্রতি ''শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা''! বলে কালী প্রতিমাকে পরিত্যাগ করে নতুন জীবনের পথে, সত্যের পথে বেরিয়ে আসে। দ্বিতীয় সাদৃশ্য হচ্ছে দু'টি নাটকেই রয়েছে একটি করে বালিকা চরিত্র। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় বালিকা রূপী সরস্বতী এবং 'বিসর্জন'-এর অপর্ণা দুজনেই নাটকের প্রধান চরিত্র দুটির মানসিক উত্তরণ ঘটানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় বালিকা বাল্মীকির অন্তরে করুণার উদ্রেক করে বাল্মীকির মানসিক উত্তরণ ঘটিয়েছে এবং 'বিসর্জন'-এ অপর্ণা রঘুপতির অন্তরে করুণার উদ্রেক করে রঘুপতির মানসিক উত্তরণ ঘটিয়েছে।

'বাল্মীকি প্রতিভা'র বিষয়বস্তু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''বাল্মীকি প্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তরগূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে।''[৫৪] 'বাল্মীকি প্রতিভা'র এই 'অন্তর্গূঢ় করুণা'র আভাস আমরা পেয়েছিলাম 'রুদ্র চন্ড' নাটকে। 'অভ্যাসের কঠোরতায়' রুদ্রচন্ডেরও মানবত্ব ঢাকা পড়েছিল। একদিন সেখানে আঘাত এল এবং সেই আঘাতে অন্তরের পাষাণ ভেঙে চূর্ণ- বিচূর্ণ হ'ল। করুণা ধারায় সিক্ত হয়ে রুদ্রচন্ডের ঘটলো নিষ্ক্রমণ। 'বাল্মীকি প্রতিভা'তে এই ভাব আরও সংঘবদ্ধভাবে, পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পেল। সংসারের দেউড়ি পার হয়ে ভিতর মহলে পা দিয়ে অনুভূত হয়েছিল ''মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জাল বুনোনি''র কথা। এই বুনন কিভাবে অথবা কিসের সাহায্যে সম্ভব? এই সম্বন্ধের অনুসন্ধান করতে গিয়েই বোঝা গেল 'অভ্যাসের কঠোরতায়' যে মানবত্ব ঢাকা পড়ে থাকে তার উন্মোচন প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তার দিকে নজর রেখেই রচনা হয় 'বাল্মীকি প্রতিভা'। মানবত্বের উপর থেকে কঠোরতার কালো পর্দা উন্মোচনের পথ খোঁজা হ'ল 'অন্তর্গূঢ় করুণা'র উৎসারণের মধ্য দিয়ে। নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন, ''এই গীতিনাট্যটির (বাল্মীকি প্রতিভা) বিষয় বস্তু অথবা ভাবপ্রকাশের মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই, ইহার যাহা কিছু রস-মাধুর্য তাহা ইহার গানগুলির মধ্যে। বিষয়বস্তুর ভিতর কোনও সত্য অথবা তত্ত্ব আবিষ্কারের উদগ্র চেষ্টাও কোথাও নাই।''[৫৫] নীহাররঞ্জন রায়ের এই মন্তব্যকে মেনে নেওয়া যায় না। 'অভ্যাসের কঠোরতা'য় মানবিক বৃত্তি ঢাকা পড়ে থাকলেও তারও উন্মোচন সম্ভব হতে পারে, এই সত্য 'বাল্মীকি প্রতিভা'র বিষয়বস্তু। বাল্মীকির চিত্তের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে একটি বালিকার কাতর আকুতিতে। এ প্রসঙ্গে শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''বাল্মীকির চিত্তে এই পরিবর্তন

এনেছে শাস্ত্র নয়, যজ্ঞ নয়, দৈবাদেশ নয়—একটি নিরাশ্রয়া ভীতা বালিকার কাতর আকুল আবেদন।"[৫৬] 'বাল্মীকি প্রতিভা'র ভাবসত্য আরও দৃঢ় ভাবে প্রকাশিত হবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে।

বাল্মীকির অন্তরে করুণার উদ্রেক ঘটার পর থেকেই তার মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। এই দ্বন্দ্ব পূর্বতন প্রথাবদ্ধ জীবনবোধের সঙ্গে নবলব্ধ চেতনার দ্বন্দ্ব। রবীন্দ্রদর্শনে সীমা ও অসীমের যে প্রকাশ তা রবীন্দ্র নাট্যের ভাববস্তুর একটি মৌলিক উপাদান বলে আমাদের ধারনা। সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশ, সীমার মধ্যেই খুঁজে নিতে হয় অসীমকে—এই তত্ত্ব প্রথম পর্যায়ের নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের ধারণা 'বাল্মীকি প্রতিভা'তেও এই সীমা-অসীমের তত্ত্বরূপ ক্ষীণভাবে প্রকাশিত। বাল্মীকি তার জীবনাভ্যাসের সীমাবদ্ধতার মধ্যে হঠাৎ এক বৃহত্তর জীবনের স্পর্শ অনুভব করল তার চিত্তকরুণার জাগরণে। এই জাগরণ যেন সীমার মাঝে অসীমের ঈষৎ আভাস দিয়ে যায় ।

এই পর্যায়ের প্রতিটি রচনার (বনফুল , কবিকাহিনী , ভগ্নহৃদয় , রুদ্রচন্ড) মধ্যেই আমরা একটি করে কবিচরিত্র পেয়েছি। 'বাল্মীকি প্রতিভা'তে এই কবি চরিত্রের সমাপ্তি। পূর্ববর্তী কবিচরিত্র গুলি থেকে বাল্মীকি স্বতন্ত্র। আমরা মনে করি মহাকাব্যের কাহিনী অবলম্বন করে 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচিত হলেও এর কবিচরিত্র পুরোপুরি স্বতন্ত্র। এ রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রক্ষেপ নয়। কিন্তু পূর্ববর্তী কবি চরিত্র গুলির মধ্যে আমরা যেমন এক বিষণ্ণতার ছায়া দেখতে পাই তেমনি ভাবে বাল্মীকি চরিত্রের মধ্যেও এই বিষণ্ণতার ছায়া পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দৃশ্যে বিষণ্ণতার আভাস আমরা পেয়ে যাই।

'জীবনস্মৃতি'র পাঠক মাত্রই আমরা জানি যে, রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে চিত্র-বিচিত্র করা কবি ম্যূরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডিস ছিল। অক্ষয়বাবুর কাছে 'সেই কবিতা গুলির মুগ্ধ আবৃত্তি ' রবীন্দ্রনাথ অনেকবার শুনেছিলেন। তিনি মনে মনে আশা পোষণ করতেন একদিন এই কবিতাগুলি তিনি সুরে শিখে এসে অক্ষয়বাবুকে শেখাবেন। বিলেতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত গান কিছু শিখেছিলেন, সেই সঙ্গে অন্যান্য বিলেতি গানও শিখেছিলেন। এই বিলেতিগান শিখে আসার পর রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনায় হাত দেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> এই দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে।... সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই।[৫৭]

পূর্ববর্তী নাটক 'রুদ্রচন্ড'- এর কাব্য নাট্যের ফর্ম থেকে সরে এসে রবীন্দ্রনাথ সংগীতকে 'নাট্যকার্যে নিযুক্ত' করে গীতিনাট্যের ফর্মে লিখলেন 'বাল্মীকি প্রতিভা'। ফর্মের এই বদল কেন ঘটলো? আমাদের ধারণা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সংগীত চর্চা এই গীতিনাট্য রচনার পিছনে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেছে এবং পাশাপাশি বিলেতে বসবাসের সময় সেখানকার শেখা সংগীত এবং তা প্রয়োগ ঘটানোর আগ্রহের ফলেই 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচিত হল সংগীতে। এই গীতিনাট্য রচনার পিছনে কার কার প্রভাব রয়েছে তা আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। কবি মূরের আইরিশ মেলডিজ- এর কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ প্রসঙ্গে Edward Thompson-এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে, "The tunes of the Genius of Valmiki are half Indian, half European, inspired by Moore's Irish Melodies."[৫৮] রবীন্দ্রনাথ যে দেশী-বিদেশী সুরের চর্চার মধ্যে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র জন্মের কথা বলেছেন Thompson তাকেই 'half Indian, half European' বলে উল্লেখ করেছেন। গানের সুরের ক্ষেত্রে এই দেশী-বিদেশীর মিলিত রূপ নাটকের কাঠামোগত রূপেরও পরিচয় বহন করে কিনা অর্থাৎ 'বাল্মীকি প্রতিভা' অপেরা ধর্মী না দেশীয় কথকতা ধর্মী তা আলোচনার পূর্বে আমরা এর সংগীতের বিষয়টি আলোচনা করে নিতে চাই। 'জীবনস্মৃতি'র দ্বিতীয় পান্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছিলেন, "অক্ষয়বাবুর রচিত দুই-তিনটি গান বাল্মীকি প্রতিভার মধ্যে আছে।"[৫৯] রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তির সূত্র ধরে ড: সুকুমার সেন মনে করেন, " পিলু/ এখন কর্ব্ব কি বল," "রাগিনী বেলাবতী / তবে আয় সবে আয়", "জংলা ভূপালী / কালী কালী বলরে আজ"- এই তিনটি গান অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা।[৬০] তবে প্রশান্তকুমার পাল 'কালী কালী বলরে আজ' গানটি প্রসঙ্গে ভিন্নমত দিয়েছেন। তাঁর মতে, "গানটি Stephen Adams-এর Nancy Lee-র সুরে বসানো। মূল গানটি রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, সুতরাং ভাঙা গানটিও তাঁরই রচনা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। গানটির কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃতি করছি :

Of all the wives as ever you know
Yes ho ! Lads Ho ! yes ho ! yes ho !
There's none like Nancy Lee, I trow
Yes ho ! Lads Ho ! yes ho !"[৬১]

এ প্রসঙ্গে সুধীর চক্রবর্তীর মতটিও স্মরণ যোগ্য, "তাঁর বাংলা গান ভাব ও ভাষা কোন দিক থেকে মূর কে অনুসরণ করেনি।... এ ক্ষেত্রে সুরের উদ্দীপনাটুকু দস্যুদলের মনের উত্তেজনার ভাব প্রকাশে কাজে লেগেছে।... কিন্তু সতর্ক পাঠক লক্ষ্য করবেন yes ho এবং 'বলো হো' এই ধ্বনি নির্মাণের সমতাটুকু। বলা বাহুল্য, 'বল হো' ধ্বনি বাঙালী বা ভারতীয় দস্যুদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। ধ্বনিটি এসেছে

মূলের প্রভাবে।"[৬২] সুতরাং 'কালী কালী বলরে আজ' গানটি Stphen Adams-এর Nancy Lee-র সুরে বসানো রবীন্দ্রনাথের রচিত গান। অন্য গান দুটি, 'এখন কর্ব্ব কি বল ' এবং ' তবে আয় সবে আয়' অক্ষয় চৌধুরীর রচনা হতে পারে। আমাদের হাতে কোন তথ্য-প্রমাণ না থাকার কারণে আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না।

'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের 'সারদা মঙ্গল' থেকে ঋণ গ্রহণের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এই সারদা মঙ্গলের আরম্ভ সর্গ হইতেই বাল্মীকি প্রতিভার ভাবটা আমার মাথায় আসে এবং সারদা মঙ্গলের দু'একটি কবিতাও রূপান্তরিত অবস্থায় বাল্মীকি প্রতিভায় গানরূপে স্থান পাইয়াছে।"[৬৩] এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অন্য আর এক জায়গায় লিখেছেন, "সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন-কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের সারদা মঙ্গলের আরম্ভ ভাগ হইতে গৃহীত।"[৬৪] 'সারদা মঙ্গল' থেকে ভাব গ্রহণ করা হলেও শেষ পর্যন্ত ভাবগত বিচারে 'বাল্মীকি প্রতিভা' পুরোপুরি ভাবে স্বতন্ত্র। 'সারদা মঙ্গল'-এ মানবিক সম্বন্ধের জাল বুননির কোন আভাস মেলে না। শুধুই কবিত্ব প্রাপ্তির এক কাব্যিক বিন্যাস। যা "কান পাতিয়া শুনিলে একটি স্বর্গীয় সংগীত সুধায় হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া ওঠে।"[৬৫] কিন্তু 'বাল্মীকি প্রতিভা' "মানব সম্পর্ক ও মনস্তত্ত্বের ক্রমবিকাশের"[৬৬] চিত্র প্রস্ফুটিত করে মানবিক অনুভূতিতে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত করে দেয়। শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "'বাল্মীকি প্রতিভা'য় রবীন্দ্রনাথের আজীবন কবি ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখা দিল হিংসার পরাজয় ও প্রেমের জয় তথা মানব ধর্মের জয়। সেখানে তিনি কৃত্তিবাস ও বিহারীলালকে অতিক্রম করে গেছেন সেই তরুণ বয়সে।"[৬৭]

"সে-যুগের ভাঙনপন্থী যুবকদের গুরুস্বরূপ"[৬৮] হার্বার্ট স্পেনসরের The origin and Function of Music প্রবন্ধটি পাঠ করার মধ্য দিয়েই সংগীত সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ লাভ করেন এবং এই ভাবনারই প্রয়োগ ঘটান 'বাল্মীকি প্রতিভা'য়। "এই ভাবনা হইতে 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যের জন্ম। এই সময়ে তাঁহার ভাবনাকে রূপদানের সুযোগও মিলিল।"[৬৯] এ প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আমরা উদ্ধৃত করলাম—

> হার্বার্ট স্পেনসরের একটা লেখার মধ্যে পড়েছিলাম যে, সচারাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনি কিছুনা কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবল মাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেনসরের এই কথাটা মনে

> লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন। আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তাল মান সংগত রীতিমত সংগীত নহে।[৭০]

'বাল্মীকি প্রতিভা'য় যেমন 'দেশী ও বিলেতি সুরের চর্চা' হল তেমনি নাট্য আঙ্গিকের ক্ষেত্রে স্পেনসরের মতটিকে গ্রহণ করে "আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয়" করা হ'ল। সংগীতের এই পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনার সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথ সংগীত বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেন। 'সংগীত ও ভাব' মেডিকেল কলেজ হলে পাঠ করলেন ১২৮৮-র ৮ বৈশাখ, ১২৮৮-র জৈষ্ঠ্য সংখ্যার ভারতীতে তা ছাপা হ'ল। স্পেনসরের The Origin and Function of Music প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখলেন 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' (হার্বার্ট স্পেনসরের মত), ১২৮৮ আষাঢ় সংখ্যা ভারতীতে তা ছাপা হ'ল। 'সংগীত ও কবিতা' শিরোনামে প্রবন্ধটি ছাপা হ'ল ১২৮৮ মাঘ সংখ্যা ভারতীতে। এই প্রবন্ধ গুলি রচনার পিছনে স্পেনসরের প্রভাব প্রবল ভাবে কাজ করেছিল বলে আমাদের ধারণা। তবে স্পেনসর পাঠের আগেই রবীন্দ্রনাথ 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। " 'সংগীত ও ভাব' - প্রবন্ধ রচনার পর হার্বার্ট স্পেনসরের রচনাবলী পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম 'The Origin and Function of Music'- নামক প্রবন্ধে যে-সকল মত অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা আমার মতের সমর্থন করে,.. ।"[৭১] মানুষের মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সংগীত এই বক্তব্যটিই রবীন্দ্রনাথ The Origin and Function of Music অবলম্বনে লিখিত 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' প্রবন্ধে উপস্থাপন করেছেন। সংগীতের মাধ্যমে মানুষের মনোভাব প্রকাশের এই পদ্ধতি গীতিনাট্যের কাঠামোগত দিক থেকে গ্রহণ করে 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচিত হলেও একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে উত্থাপন করা যেতে পারে, তা হ'ল 'বাল্মীকি প্রতিভা' কি অপেরা? অনেকেই 'বাল্মীকি প্রতিভা'কে বিদেশী অপেরার অনুকরণে লিখিত বলে দাবী করেছেন। আবার অনেকে একে দেশীয় কথকতার আঙ্গিকে লিখিত বলে মনে করেন। আমরা উভয় মত পর্যালোচনা করে আমাদের মত প্রকাশে সচেষ্ট হব। সৌমিত্র বসু ও বার্ণিক রায় হ্যাগনেরের Music Drama-র সঙ্গে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। সৌমিত্র বসুর মতে—

> ১৮৭৮-৭৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংল্যান্ডে, হ্যগনারীয় অপেরা য়ুরোপে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই জনপ্রিয়তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ না

করার কোন কারণ নেই। 'বাল্মীকি প্রতিভা' যে হুগনারীয় ধরণে কথা, সুর ও শরীরের সুসমঞ্জস প্রয়োগের কথা মনে রেখে লেখা তাই শুধু নয়, এই নাট্যাচার্যের মতই তিনি বিষয় হিসেবে বেছে নিচ্ছেন পুরাণ কথা বা কিংবদন্তী এবং তাকে ব্যবহার করতে চাইছেন চিরায়ত সত্য হিসাবে।[৭২]

বার্ণিক রায় জানাচ্ছেন—

> হ্বাগনেরের ১৮৭৭ সালে তাঁর বিখ্যাত রিচুয়াল-সমন্বিত 'পার্সিফাল' রচনা করেছেন জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে; এই বছরই লন্ডনের আলবার্ট হলে সাতই মে থেকে ঊনত্রিশ মে পর্যন্ত আর্টটি কনসার্ট বাজিয়ে শোনান। হ্বাগনেরের সংগীত ও গীতিনাট্য তখন লন্ডনে স্যাভয় থিয়েটারের বিরুদ্ধে নতুন সংগীত গীতিনাট্যের প্রেরণা এনে দিয়েছে; প্রায়শ অভিনীত হচ্ছে বিভিন্ন থিয়েটারে হ্বাগনেরের গীতিনাট্য। আর সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে এসে পৌঁছুলেন; তাই তখন স্যাভয় থিয়েটারের হাসিঠাট্টা কৌতুকময় অপেরা ও হ্বাগনেরের গীতিনাট্য বা মুজিক ড্রামা দুয়েরই স্পর্শ ও প্রেরণা লেগেছে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে।[৭৩]

প্রথমবার বিলেতে বসবাস কালে এই জাতীয় নাটক দেখা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব নয় কিন্তু তাই বলে আমরা, ''বিলেতি অপেরার আদর্শে লেখা হয়েছিল 'বাল্মীকি প্রতিভা' ''[৭৪] এতটা সরলীকরণ বোধহয় করতে পারি না। পুলিন দাস মন্তব্য করেছেন—

> ইংল্যান্ড বাসের সময় লন্ডন অপেরার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটাই স্বাভাবিক। হাববুর্গ-এর বেহালা বাদক কার্ল রোসা প্রযোজিত 'দ্য ফ্লাইং ডাচম্যান' (১৮৭৬), 'রিয়েনজি' (১৮৭৯), 'কারমেন' (১৮৭৯) প্রভৃতি তখন লন্ডনে খুবই জনপ্রিয়। বিলেতি অপেরার অনুকরণ নয় 'বাল্মীকি প্রতিভা'। ইউরোপীয় অপেরায় গানের আধিপত্য এতো প্রবল যে গান যখন গাওয়া হতে থাকে নাটকের গতি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। 'বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয়টাই মুখ্য' হওয়াতে সঙ্গীত এমনভাবে প্রযুক্ত যে নাট্যকে সে প্রতিহত করে না সচল করে রাখে। অপেরা নয় বরং দেশীয় কথকতার ধারাটাকেই রবীন্দ্রনাথ নতুন ভাবে প্রয়োগ করে গড়ে তোলেন 'বাল্মীকি প্রতিভা'কে''।[৭৫]

ড: গৌরীশংকর ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, "... রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার উন্নত রূপ বলিয়া মনে করা যায় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।"[৭৬] 'বাল্মীকি প্রতিভা' সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, "প্রাচীণ কৃষ্ণযাত্রায় এই রীতি অবলম্বন করা হইত।"[৭৭] রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে এ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন—

> বস্তুত বাল্মীকি প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্য গ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নতুন পরীক্ষা; অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোন স্বাদ গ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি প্রতিভা তাহা নহে, ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্য বিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।[৭৮]

অপেরা হিসেবে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র পরিচয় রবীন্দ্রনাথ নিজেই নাকচ করে দিয়েছেন। এখানে সংগীত মুখ্য নয়, নাটকই মুখ্য। অপেরা সংগীত প্রধান সেখানে নাটক মুখ্য নয়। "There is first of all the convention by which the whole drama is sung instead of being spoken; and besides this there are often occasions when the whole action of the play is held up while piece of music is sung."[৭৯] কিন্তু 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় সুরের কোন প্রাধান্য নেই এবং সে কারণেই নাটকের গতি থমকে যাওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। সেখানে "কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটাই উৎকর্ষ সাধন করিয়া"[৮০] নাট্যকাঠামোয় প্রয়োগ করা হয়েছে। আমাদের ধারণা হার্বার্ট স্পেনসরের সংগীত সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রভাব এবং দেশীয় কথকতা, যাত্রা, পালাগান ইত্যাদির মিশেলে 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচিত হয়েছে। অপেরার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের বিশ্বাস হ্যাগনেরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যদি রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনা করতেন তবে অবশ্যই তা 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করতেন। যেখানে তিনি 'বিলেতি সুরের চর্চা'র কথা এবং হার্বার্ট স্পেনসরের প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন সেখানে কেন তিনি হ্যাগনেরের প্রভাব বা অপেরার প্রভাবের কথা লিখলেন না তা ভাববার বিষয়। বিলেতে অপেরা দেখার অভিজ্ঞতাও যেমন আছে তেমনি ছোট বেলার দেখা যাত্রা এবং পালাগানের অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে। সুতরাং 'বাল্মীকি প্রতিভা' অপেরার আদলে নয় বরং দেশীয় কথকতা, পালাগান এবং যাত্রার আদলেই নির্মিত হয়েছে এবং তার সাথে মিশেছে হার্বার্ট স্পেনসরের "The Origin and Function of Music"-এর অনুপ্রেরণা।

পরবর্তী পর্যায়ে যখন রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারার নাটকের বিকাশ ঘটবে সেখানে দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ দেশীয় যাত্রার ফরমটিকে গ্রহণ করে বাংলা নাটকে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন।

আমাদের ধারণা তারই সূত্রপাত এই 'বাল্মীকি প্রতিভা'তে। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারার নাটকের বীজাকার সম্ভাবনা 'বাল্মীকি প্রতিভা'তেই আমরা প্রত্যক্ষ করি।

গ. কাল মৃগয়া

অভিনয়ের প্রয়োজনে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে যেমন লেখা হয়েছিল 'বাল্মীকি প্রতিভা' তেমনি 'কালমৃগয়া'ও রচিত হ'ল অভিনয়ের প্রয়োজনে এবং রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে। 'কালমৃগয়া' প্রকাশিত হয় ৫ ডিসেম্বর ১৮৮২।[৮১] বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে এর অভিনয় হয় ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২।[৮২] 'কালমৃগয়া' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> বাল্মীকি প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া। দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল; ইহার করুণ রসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকি প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।[৮৩]

'বাল্মীকি প্রতিভা'য় সংগীত সম্পর্কিত যে নতুন পন্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হ'ল তারই আলোকে রচিত হল 'কালমৃগয়া', আর এই রচনায় প্রাধান্য পেল করুণ রস। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার কারণে 'কালমৃগয়া'র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষিত হয়নি। কিন্তু অনেক পরে রবীন্দ্ররচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খন্ডে 'কালমৃগয়া' স্থান পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, ''দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্ররচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খন্ডে (আশ্বিন ১৩৪৭) নাটিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয় (দ্রঃ অ- ১। ৩১৭ - ৩৮)। গীতবিতান ৩য় খন্ড সংকলন কালে (আশ্বিন ১৩৫৭) নাটিকাটি 'গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য' পর্যায়ে মুদ্রিত হয় (দ্রঃ ৩ / ৬১৭- ৩৪)।''[৮৪]

'কালমৃগয়া' ছয়টি দৃশ্যে বিন্যস্ত নাটিকা। অন্ধ ঋষি তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তার একমাত্র পুত্রকে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল আনতে বলে। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার তাকে নিষেধ করে। কারণ—

> গভীর রজনী, ঘোর ঘন গরজে,
> তুই যে এ অন্ধের নয়ন তারা। (৩য় দৃশ্য)

ঋষিকুমার পিতার নিষেধ অমান্য করে সরযু নদী থেকে জল আনতে যায়। চতুর্থ দৃশ্যে বনদেবতার গানে অশুভের ইঙ্গিত প্রতিধ্বনিত হয় —

সব চরাচর আকুল —
কি হবে কে জানে,
ঘোর রজনী,
দিক - ললনা ভয় বিহ্বলা। (৪র্থ দৃশ্য)

বনদেবীগণ ঋষি কুমারকে নিষেধ করে —

এই ঘোর আঁধার, কোথা রে যাও!
ফিরিয়ে যা, তরাসে প্রাণ কাঁপে। (৪র্থ দৃশ্য)

কিন্তু পিতা যে তৃষ্ণায় কাতর তাই ঋষিকুমার বলে—

না, কোরো না মানা, যাব ত্বরা। (৪র্থ দৃশ্য)

বনদেবীগণের নিষেধ অমান্য করে ঋষিকুমার জল আনতে যায়। বনদেবীগণ গেয়ে ওঠে —

... অমঙ্গল হেন প্রাণে জাগে কেন,
থেকে থেকে যেন প্রাণ কেঁদে ওঠে। (৪র্থ দৃশ্য)

পঞ্চম দৃশ্যে শিকারীদের সঙ্গে দশরথকে শিকারের সন্ধান করতে দেখা যায়। এই দৃশ্যটি 'বাল্মীকি প্রতিভা'র চতুর্থ দৃশ্যটিকে স্মরণ করায়। সরযূ তীরে জলপান করার শব্দ শুনে দশরথ বাণ নিক্ষেপ করে, নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বনদেবীগণ বিলাপ করে ওঠে —

হায় কি হ'ল! হায় কি হ'ল! (৫ম দৃশ্য)

দশরথের নিক্ষিপ্ত এই বানে মৃত্যু ঘটে ঋষিকুমারের। ৬ষ্ঠ দৃশ্যে দেখা যায় দশরথ ঋষিকুমারের মৃতদেহ নিয়ে আসে অন্ধঋষির কাছে। একমাত্র পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে অন্ধঋষি দশরথকে অভিশাপ দেয়। দশরথ ঋষির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে —

ক্ষমা কর মোরে তাত,
আমি যে পাতকী ঘোর ,
না জেনে হয়েছি দোষী,
মার্জ্জনা নাহি কি মোর! (৬ষ্ঠ দৃশ্য)

কিছুক্ষণ পর দশরথকে ঋষি বলে ওঠেন—

শোকতাপ গেল দূরে,
মার্জ্জনা করিনু তোরে! (৬ষ্ঠ দৃশ্য)

এই হচ্ছে কালমৃগয়ার কাহিনী।

এখানে নাট্যদ্বন্দ্বের কোনই প্রকাশ নেই। অন্ধ ঋষির অন্তরে পুত্রের মৃত্যু জনিত কারণে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় তা পরমুহূর্তেই আবার নির্বাপিত হয়ে ঋষির ক্ষমাশীল অন্তর জাগ্রত হয়ে ওঠে। ক্ষণিকের বিধ্বস্ত মন 'মার্জ্জনা'র মহান উদ্ভাসনে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। একে কি মানসিক উত্তরণ বলবো আমরা? কিন্তু উত্তরণ ঘটার আগে যে মানসিক দ্বন্দ্বের প্রয়োজন তারই বা অবকাশ এখানে কোথায়? এখানে শুধুই দ্বন্দ্বহীন এক করুণ উপাখ্যানের প্রকাশ। ''ইহার করুণ রসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন'' ঠিকই কিন্তু এর নাট্যদ্বন্দ্বের আঘাতে নিশ্চয়ই শ্রোতারা ক্ষত-বিক্ষত হননি। কারণ এই ক্ষুদ্র নাটিকায় কোথাও কোন দ্বন্দ্বের চিহ্নমাত্র নেই। না ঘটনার দ্বন্দ্ব, না চরিত্রের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব কোন-কিছুরই আভাস এই নাটকে মেলে না। আর সে কারণেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন অনুভব করেননি, পরবর্তীকালে বাল্মীকি প্রতিভার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। 'কালমৃগয়া'র করুণ রস প্রসঙ্গে বার্ণিক রায় মন্তব্য করেছেন, ''এর কারণ হচ্ছে এই যে মার্গ সংগীতের বিশুদ্ধ সুর এমন গভীরে মানুষের মনকে দোলা দিয়ে অসীমের দিকে আকৃতি জানিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে যে, তখন অভিনয়ের বুদ্ধি কৌশল ও অন্তরের দ্বৈতলীলা কাহিনী বা ঘটনাকে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।''[৮৫]

রবীন্দ্রনাট্যের এই পর্যায়ের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য কারুণ্য তা অন্যান্য নাটকের মত 'কালমৃগয়া'-তেও উপস্থিত। কিন্তু অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো একেবারেই অনুপস্থিত। যেমন এই পর্যায়ের প্রতিটি নাটকে একজন করে বালিকার উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই, যে বালিকার দ্বারা নাটকের মূল -বিষয় নিয়ন্ত্রিত। 'কালমৃগয়া'য় লীলা শুধু মাত্র ঋষিকুমারের খেলার সাথী। কাহিনী নিয়ন্ত্রণে তার কোনই ভূমিকা নেই। কিন্তু 'কালমৃগয়া'তে নতুন সংযোজিত হয়, 'বনদেবীগণ'। এ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ''এই কালমৃগয়াতে প্রথম বনদেবীর পাট শুরু হয়।''[৮৬] রবীন্দ্রনাথ এই 'বনদেবীগণে'র ধারণাটি কোথা থেকে গ্রহণ করলেন? এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ''আমাদের মনে হয় বনদেবীগণ গ্রীকনাটকের কোরাসের দূরপ্রতিধ্বনি এবং লৌকিক যাত্রা অভিনয়ের সখীদের সংস্কৃত রূপ।''[৮৭] গ্রীক নাটকে কোরাস একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে নাটকের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকে। নাট্যক্রিয়ায় পরবর্তী কালে সংঘটিত

কাহিনীর আগাম আভাস কোরাসের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। 'কালমৃগয়া'র বনদেবীগণের সঙ্গে গ্রীকনাটকের কোরাসের 'দূর প্রতিধ্বনি'র যে কথা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন তা সমর্থন যোগ্য বলে আমরা মনে করি। কারণ নাট্যক্রিয়ায় মূল ভূমিকা পালন না করলেও নাট্যক্রিয়ার পরবর্তী ঘটনার আগাম আভাস বনদেবীগণের মাধ্যমে আমরা পাই। যেমন চতুর্থ দৃশ্যে বনদেবীগণ ঋষিকুমারকে জল আনতে যেতে নিষেধ ক'রে বিপদের আগাম আভাস দিচ্ছে —

এই ঘোর আঁধার কোথারে যাস!
ফিরিয়ে যা তরাসে প্রাণ কাঁপে!
স্নেহের পুতুলি তুই,
কোথা যাবি একা এ নিশীথে!
কি জানি কি হবে, বনে হবি পথহারা!

ঋষিকুমার নিষেধ না শুনে জল আনার জন্য চলে গেলে বনদেবীগণ গেয়ে ওঠে —

অমঙ্গল হেন প্রাণে জাগে কেন,
থেকে থেকে যেন প্রাণ কেঁদে ওঠে !

অভিনেতার সঙ্গে কোরাসের কথোপকথনের যে বৈশিষ্ট্য গ্রীক নাটকে দেখা যায় তারও পরিচয় মেলে 'কালমৃগয়া'র চতুর্থ দৃশ্যে ঋষিকুমারের সঙ্গে বনদেবীগণের সংলাপে। সুতরাং এসব দিক বিবেচনায় নিলে রবীন্দ্র জীবনীকারের মতকে সমর্থন করতে হয়। কিন্তু বনদেবীগণ যাত্রার ''সখীদের সংস্কৃত রূপ'' এই মন্তব্যটি বোধহয় মানা যায় না। কারণ, যাত্রার সখীরা কাহিনীর সঙ্গে কখনই সম্পৃক্ত নয় কিন্তু বনদেবীগণ নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। শুধু নাচ-গানের নিরিখে বিচার করলে এই দুটো জিনিসকে একসাথে মিলিয়ে নেবার কোন অবকাশ থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে যখন 'মায়ার খেলা' লেখেন তখন সেই নাটকে আমরা 'মায়াকুমারীগণে'র উপস্থিতি দেখতে পাই। আমাদের ধারণা 'মায়াকুমারীগণ' 'কালমৃগয়ার' এই 'বনদেবীগণের' আদলেই তৈরী।

সুকুমার সেন 'কালমৃগয়া' প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, ''প্রথম দৃশ্যে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর পূর্বাভাস আছে।''[৮৮] ড: সেন কি কারণে 'কালমৃগয়া'র প্রথম দৃশ্যে 'প্রকৃতির-প্রতিশোধ'-এর পূর্বাভাস পেলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। ''এই পালার মধ্যে এই তত্ত্বকথাটুকু পরিস্ফুট যে অন্ত: প্রকৃতি হোক আর বহিঃপ্রকৃতি হোক তাহাকে নিপীড়ন অথবা প্রত্যাখ্যন করিয়া মানুষ জীবনের দু:খ পরম্পরা

এড়াইতে সমর্থ হয়না, অর্থাৎ নিরপেক্ষ স্বাধীনতা বা আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ করিতে পারে না।''[৮৯] এই যদি 'প্রকৃতির -প্রতিশোধ'-এর মূল তত্ত্ব হয় তাহলে তার পূর্বাভাস কী ভাবে 'কালমৃগয়া'র প্রথম দৃশ্যে ধরা পড়ে! 'কালমৃগয়া'র প্রথম দৃশ্য তো শুধু মাত্র দুটো বালক-বালিকার কথোপকথন। একজন লীলা এবং অন্যজন ঋষিকুমার। আমরা এই দু'জনের সংলাপ সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করছি। এর মাধ্যমেই পরিষ্কার হবে যে 'কালমৃগয়া'র প্রথম দৃশ্য শুধু মাত্র খেলার ছলে দুটো বালক-বালিকার সংলাপ, সেখানে কোনই তত্ত্ব কথা নেই।

লীলা। ও ভাই, দেখে যা,
কত ফুল তুলেছি!

ঋষিকুমার। তুই আয়রে কাছে আয়,
আমি তোরে সাজিয়ে দি! ...

লীলা। ও দেখবি রে ভাই, আয়রে ছুটে,
মোদের বকুল গাছে
রাশি রাশি হাসির মত
ফুল কত ফুটেছে।...

লীলা। কাল সকালে উঠব মোরা
যাব নদীর কূলে —
শিব গড়িয়ে করবো পূজো,
আনব কুসুম তুলে।

ঋষিকুমার। মোরা ভোরের বেলা গাঁথব মালা,
দুলব সে দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশি গান গাহিব
বকুলের তলায়।

লীলা। না ভাই, কাল সকালে মায়ের কাছে
নিয়ে যাব ধরে,
মা বলেছে ঋষির সাজে
সাজিয়ে দেবে তোরে।

ঋষিকুমার। সন্ধ্যা হয়ে এল যে ভাই,

এখন যাই ফিরে —

একলা আছেন অন্ধ পিতা

আঁধার কুটীরে।

এই হচ্ছে 'কালমৃগয়া' নাটকের প্রথম দৃশ্যে লীলা ও ঋষিকুমারের সংলাপ। এখানে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের পূর্বাভাস কোথায়?

ঘ. প্রকৃতির প্রতিশোধ

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' বই আকারে প্রকাশিত হয় ২৯ এপ্রিল ১৮৮৪। 'বেঙ্গললাইব্রেরীর পুস্তক তালিকা অনুযায়ী' এই তথ্যটি দিয়েছেন প্রশান্তকুমার পাল।[৯০] তবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লেখার সূচনা হয়েছিল কারোয়ারে ১৮৮৩ সালে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''এই কারোয়ারে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম''।[৯১]

একজন সন্ন্যাসীকে ঘিরে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর কাহিনী নির্মাণ হয়েছে। প্রকৃতির মায়াফাঁদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সন্ন্যাসী গুহার আঁধারে সাধনায় নিমগ্ন হয়। সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর গুহা থেকে বেরিয়ে এসে সংসার, সাধারণ মানুষের ক্রিয়াকর্ম তার কাছে মনে হয় তুচ্ছ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সন্ন্যাসীই আবার পৃথিবীর মায়ায় জড়িয়ে পড়ে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর এই কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে ১৬টি দৃশ্যে। প্রথম দৃশ্যে- দৃশ্যপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'গুহা'। 'আঁধারে গুহার মাঝে' সন্ন্যাসী দীর্ঘদিন ধরে সাধনা করছে। 'রাক্ষসী প্রকৃতি'র 'মায়াফাঁদ' থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সন্ন্যাসীর এই সাধনা। সন্ন্যাসী বলছে —

কী কষ্ট না দিয়েছিস রাক্ষসী প্রকৃতি

অসহায় ছিনু যবে তোর মায়া ফাঁদে। ...

বাসনারে ডেকে এনে প্রলোভন দিয়ে

নিয়ে গিয়েছিস মহা দুর্ভিক্ষ-মাঝারে। (১ম দৃশ্য)

'রাক্ষসী প্রকৃতি'র প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্য ধ্যান নিমগ্ন সন্ন্যাসীর গুহাবাসে ''অনাদি কালের রাত্রি সমাধিমগনা/ নিশ্বাস করিয়া রোধ পাশে বসে আছে।'' শিলার ফাটল দিয়ে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ছে, আঁধারে 'প্রাচীন ভেকের দল' ঘুমিয়ে আছে, বাদুড় দূর থেকে নিয়ে আসে অমানিশীথের বার্তা,

আবার কখনো কখনো 'দিবসের গুপ্তচর রজনীর মাঝে' একটি আলোর রেখা কোথা থেকে এসে উঁকি মেরে আবার মিলিয়ে যায়। এরই মাঝে একদিন সন্ন্যাসীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে। এরপর সন্ন্যাসী বেরিয়ে আসে গুহার অন্ধকার থেকে এবং প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করে বলে—

দেখাব হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে,
এই দেখ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি,
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল,
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে সেথায়। (১ম দৃশ্য)

দ্বিতীয় দৃশ্য 'রাজপথ'। গুহা থেকে বেরিয়ে সন্ন্যাসী পথের ধারে দাঁড়িয়ে চলমান সংসারকে দেখছে। তার মনে হচ্ছে যে বিরাট মুক্তি সে পেয়েছে তার তুলনায় এই বিশ্ব ক্ষুদ্র। এই চলমান মানুষ সন্ন্যাসীর কাছে অপরিচিত মনে হচ্ছে। সে বুঝতে পারছে না কেন এরা কোলাহল করছে, এরা কি চায়, কিসের জন্য এরা এত ব্যস্ত। সাধনার আগে বিশ্ব বৃহৎ ছিল, 'তখন মানুষ ছিল মানুষের মতো', কিন্তু আজ সাধনার দ্বারা প্রেম, প্রীতি, স্নেহ বন্ধন থেকে মুক্ত সন্ন্যাসীর কাছে সবই অর্থহীন মনে হচ্ছে, সবই ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। এক অবজ্ঞার দৃষ্টি নিয়ে তাই সন্ন্যাসী সংসারের খেলা দেখছে। গান গাইতে গাইতে একদল কৃষক প্রবেশ করে। তারা গাইছে "হেদে গো নন্দরানী,/ আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।" শ্যামকে নিয়ে তারা গোষ্ঠে যাবে, কারণ প্রভাত হচ্ছে, সূর্য উঠছে, বনে বনে ফুল ফুটেছে, এমন দিনে ঘরে বসে থাকা যায় না। এই সুন্দর দিনে তারা শ্যামকে নিয়ে আনন্দ করবে। এই গানটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' এবং 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সূচনা অংশে উল্লেখ করেছেন। 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—

কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধের কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটা আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া গাহিতে গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম -

হ্যাদে গো নন্দরানী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও...

সকালের সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখালবালকরা মাঠে যাইতেছে - সেই সূর্যোদয়, সেই ফুল ফোটা, সেই মাঠে বিহার, তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না; সেই খানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে, সেই খানেই অসীমের সাজপরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায়; সেই খানেই

> মাঠে-ঘাটে বনে-পর্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় তাহারা যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে; দূরে নয়, ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, তাহাদের উপকরণ অতি সামান্য, পীতধড়া ও বনফুলের মালাই তাহাদের সাজের পক্ষে যথেষ্ট - কেন না, সর্বত্রই যাহার আনন্দ তাহাকে কোনো বড়ো জায়গায় খুঁজিতে গেলে, তাহার জন্য আয়োজন আড়ম্বর করিতে গেলেই লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিতে হয়।[৯]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর 'সূচনা'য় লিখেছেন —

> কারোয়ার থেকে জাহাজে আসতে আসতে হঠাৎ যে গান সমুদ্রের উপর প্রভাত সূর্যালোকে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল তাকে নাট্যীয় বলা যেতে পারে, অর্থাৎ সে আত্মগত নয়, সে কল্পনায় রূপায়িত। 'হেদে গো নন্দরানী' গানটি একটি ছবি, যার রস নাট্যরস।[১০]

দু'টি বিপরীত দৃশ্যের অবতারণা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ এই গানটি সংযোজনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যা 'নাট্যীয়'। একদিকে সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রশান্তি লাভ, যা সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত, অন্যদিকে তুচ্ছতার মধ্যে আনন্দের অনুসন্ধান, কৃষকদের গানে যা উপস্থাপিত। একদিকে সন্ন্যাসী, আর একদিকে সংসার। একদিকে জীবন বিমুখতা আর একদিকে জীবনমুখিনতা। এই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বই ধীরে ধীরে এই নাটকে প্রকটিত হয়ে উঠবে। চলমান দৃশ্যের মত কৃষকরা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে বালক পুত্র সহ একজন স্ত্রীলোক। তারপর প্রবেশ করে কিছু পথিক। এভাবেই একের পর এক মানুষের দল প্রবেশ করে এবং তাদের নিত্যদিনের সুখ-দুঃখের কথা শুনিয়ে যায়। আর সন্ন্যাসী সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পথের ধারে বসে থেকে মানুষের চলমান দৃশ্য দেখে ভাবে —

> সকাল হইতে আছি, কী দেখনু হেথা?
> এ দীর্ঘ পরান মোর সংকুচিত ক'রে
> পারি কি এদের সাথে মিশিতে আবার।
> কী ঘোর স্বাধীন আমি! কী মহাআলয়।
> জগতের বাধা নাই — শূন্যে করি বাস। (২য় দৃশ্য)

তৃতীয় দৃশ্য, 'অপরাহ্ন। পথ'। এই দৃশ্যে ধর্মভ্রষ্ট রঘুর দুহিতার সঙ্গে সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয়। সবাই যখন এই বালিকাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে তখন বালিকা সন্ন্যাসীর কাছে এসে আশ্রয় প্রার্থণা করে। সন্ন্যাসী

বালিকাকে নিয়ে বালিকার কুটিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে পথের এই পটভূমিতে বালিকার সাক্ষাৎ একটি ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

চতুর্থ দৃশ্য, 'পথপার্শ্বে বালিকার ভগ্নকুটীর'। এই দৃশ্যে সন্ন্যাসীর দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। বালিকা পিতা বলে সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী চমকে ওঠে, "আহা পিতা বলে কে ডাকিলি ওরে!" কিন্তু এ ক্ষণিকের জন্য। পরমুহূর্তেই সন্ন্যাসীর মনে হয় "জগৎ জীবন্ত মৃত্যু—অনন্ত যন্ত্রণা!" এক সময় সন্ন্যাসীর মনে হয় প্রকৃতি মায়াফাঁদ পেতে আবার তাকে বন্দি করতে চাচ্ছে, "যেন এই বালিকার ছোটো হাত দুটি/ হৃদয়েরে অতি ধীরে করিছে বেষ্টন", তাই পলায়ন প্রয়োজন, "পালা, পালা, এই বেলা, পালা এই বেলা।" কিন্তু দীর্ঘদিনের সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করেছে সে পালাবে কেন? সে তো প্রকৃতিকে জয় করেছে। তাই সন্ন্যাসীকে বলতে হয় —

কোলাহল-মাঝে আমি রচিব নির্জন,
নগরে পথের মাঝে তপোবন মোর,
পাতিব প্রলয়াসন সৃষ্টির হৃদয়ে। (চতুর্থ দৃশ্য)

পঞ্চম দৃশ্য, 'গুহাদ্বারে'। এই দৃশ্যে শুধু বালিকা আর সন্ন্যাসীর কথোপকথন। সন্ন্যাসীর মধ্যে এখন থেকে চলেছে দুই জগতের দ্বন্দ্ব। বালিকাকে স্পর্শ করে মনে হচ্ছে "আহা, তোর স্পর্শ ধ্যানের মতন-/ সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে"। আবার পর মুহূর্তেই মনে হচ্ছে "এ কি মায়া? এ কি স্বপ্ন? এ কি মোহ মোর?" এই দোলাচলতাকে অনেকটা বাস্তবসম্মত করার জন্য কয়েকটি দৃশ্য ব্যবহার করেছেন লেখক। তার চিত্ত চাঞ্চল্য - গুহাবন্দী জীবনকে গ্রহণ করার ইচ্ছা এবং এই সংসারের দিকে টান সব মিলিয়ে নাট্যকার তার মাধ্যমে বাস্তব সম্মত মানুষের জীবনের টানাপোড়েনের ইংগিত দিতে চান যেন।

ষষ্ঠ দৃশ্যে সন্ন্যাসীর অন্তরের দ্বন্দ্বটি পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পায়। এই দৃশ্যে দৃশ্যপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে গুহাদ্বার, সময় অপরাহ্ন। গুহাদ্বারও সন্ন্যাসীর অর্ন্তদ্বন্দ্বের প্রতীক হয়ে ওঠে। বালিকা বন থেকে ফুল তুলে এনে গুহাদ্বারে সন্ন্যাসীর জন্য অপেক্ষা করছে। এখন সন্ন্যাসীর সবই অর্থহীন মনে হয়। তার মনে হয়, "এ কীরে মদিরা আমি করিতেছি পান!" যেন "ধীরে ধীরে মোহময় মরণের ছায়া" গ্রাস করছে। তাই ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ন্যাসী বলছে, "দূর হোক-এসকল কিছু ভালো নয় -"। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার তাকে বলতে হয় "বাছারে, অমন করে চাহিয়া কেন রে!". সন্ন্যাসীর চিত্তচাঞ্চল্য আরও বেশি ভাবে প্রকট হতে দেখা যায় এই দৃশ্যের শেষে যখন সন্ন্যাসী বলে ওঠে—

দাও, বৎসে, এনে দাও ফল ফুল তব,

দেখাও কোথায় বাছা লতাটি তোমার -

না, না, আমি চলিলাম নগর ভ্রমিতে।

দু দন্ড বসিয়া থাকো, আসিব এখনি।

সপ্তম দৃশ্য, 'পর্বত শিখরে সন্ন্যাসী '। এই দৃশ্যেও একদিকে সন্ন্যাসী আর একদিকে সাধারণ মানুষ। সন্ন্যাসী পর্বত শিখরে বসে রাস্তার মানুষকে প্রত্যক্ষ করছে। মানুষের কণ্ঠে গান, এই গানে উঠে এসেছে প্রকৃতি বন্দনার কথা এবং প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষার কথা। কিন্তু সন্ন্যাসী পর্বত শিখর চূড়ায় বসে প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করে বলছে—

আমি আজি প্রভূ তোর, তুই দাসী মোর,

মায়াবিনী দেখা তোর মায়া অভিনয়,

দেখা তোর জগতের মহা ইন্দ্রজাল।

অষ্টম দৃশ্য, 'গুহাদ্বারে'। এখানে সন্ন্যাসীর মনের রূপান্তর প্রকাশ পেয়েছে। গুহাদ্বারে বালিকা, সন্ন্যাসী বলছে—

আয় তোরা কাছে আয়, কে আসিবি আয় —

সকলি সুন্দর হেরি এ বিশ্বজগতে।

গুহা দেখে তার মনে হচ্ছে, ''এ কী অন্ধকার হেথা! এ কী বদ্ধ গুহা!'' আর গুহার বাইরে, ''আহা এ কী সুমধুর! এ কী শান্তি সুধা!'' কিন্তু তখনো সন্ন্যাসীর মুক্তি-মোহ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায় নি। তাই তাকে দেখা যায় দ্বিধা-চঞ্চল। সে তো অনন্তের পানে ভেসে চলেছে, তার ফিরবার কোন পথ নেই। সন্ন্যাসীর মনে হয়, ''ক্ষুদ্র এ আলোতে এসে হনু দিসেহারা, / আঁধার দেয় না কভু পথ ভুলাইয়া।'' তাই সন্ন্যাসী পুনরায় ফিরে যায় অন্ধকার গুহার মাঝে। নবম দৃশ্যে গুহায় বসে সন্ন্যাসীর মনে হয়, ''আহা এ কী শান্তি, এ কী গভীর বিরাম।'' কিন্তু এই অন্ধকার গুহার মাঝে বালিকা আলো হাতে প্রবেশ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সন্ন্যাসীর অন্ধকার জীবনে নিয়ে আসে সংসারের আহ্বান। তাই সন্ন্যাসীকে বলতে হয়—

সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি,

সহসা জগৎ হতে কে তোরে পাঠালে?

সেথা হতে সাথে করে কেন নিয়ে এলি

দিবালোক, পুষ্পগন্ধ, স্নিগ্ধ সমীরণ! (নবম দৃশ্য)

দশম দৃশ্যে গুহার বাইরে এসে সন্ন্যাসীর মনে হয়, ''এ জগৎ মিথ্যা নয়''। মনে হচ্ছে ''আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া/ অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!'' কিন্তু এই বোধ বেশিক্ষণ স্থায়িত্ব লাভ করে না। সন্ন্যাসীর মনে হয়, ''জগৎ-চক্রের মাঝে যেতেছি পড়িতে -'', তাই ''যাক্ ছিঁড়ে! গেল ছিঁড়ে! চল্ ছুটে চল্!/ চল্ দূরে—যতদূরে চলেরে চরণ।'' এই দৃশ্যটিতেও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি রয়েছে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার পার্থক্য উপস্থাপনের জন্য দেখা দিয়েছে দু'জন পথিক।

একাদশ দৃশ্য, 'পথে সন্ন্যাসী'। স্নেহ-মোহবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার আশায় সন্ন্যাসী অনেক দূরে চলে এসেছে। পিছনে পড়ে রইল বালিকার স্নেহের বন্ধন। কিন্তু দূরে এসেও সন্ন্যাসীর মুক্তি নেই, কারণ, ''সেই মুখ বার বার জাগিতেছে মনে''। সন্ন্যাসীর মনে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে —

আমি কেন দিবানিশি প্রাণপণ করে
যুঝিতেছি সংসারের স্রোত প্রতিকূলে।

সন্ন্যাসী যখন চোখ বুঁজে প্রার্থণা করছে, ''হৃদয়রে হৃদয়রে, শান্ত হও, যাক সব দূরে - / যাক দূরে যাক চলে মায়া-মরীচিকা।'' ঠিক তখনই ''পিতা, পিতা, কোথা তুমি পিতা'' বলে বালিকা এসে সামনে দাঁড়াচ্ছে। সন্ন্যাসীর যেন মুক্তি নেই আর সে কারণেই তাকে বলতে হয় —

আয় রে বালিকা তোরে বুকে করে নিয়ে
যেথা ছিনু ফিরে যাই সেই গুহা মাঝে।

দ্বাদশ দৃশ্য, 'গুহার দ্বার'। এই দৃশ্যে সন্ন্যাসীর মনে হচ্ছে তার সাধনা বুঝি শেষ হয়ে গেল। গুহার অন্ধকারের মধ্যে বিশ্বের আলো এসে ঢুকে পড়েছে। জগতের সমস্ত দৃশ্য ফুটে উঠছে গুহার অন্ধকারে। বালিকাই তার সাধনার ব্যঘাত ঘটাচ্ছে। বালিকাকে মনে হচ্ছে 'প্রকৃতির গুপ্তচর'। কিন্তু সন্ন্যাসীকে তো এই বন্ধন ছিন্ন করতে হবে, ''এখনো হইব জয়ী, ছিঁড়িব শৃঙ্খল।''

ত্রয়োদশ দৃশ্য, 'অরণ্য, ঝড়বৃষ্টি, রাত্রি'। গুহা থেকে পালিয়ে সন্ন্যাসী চলে এসেছে অরণ্যে। কিন্তু এখানেও তার মুক্তি নেই। এই অরণ্যে, এই রাত্রে, এই ঝড়বৃষ্টির প্রলয় তান্ডবের মধ্যেও বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সন্ন্যাসীর মনে হচ্ছে কোথায় গেলে এর হাত থেকে মুক্তি পাব, ''কোন্ অন্ধকারে-/ জগতের কোন্ প্রান্তে, নিশীথের বুকে -/ ধরনীর কোন্ ঘোর, ঘোর গর্ভতলে -/ এ ধ্বনি কোথায় গেলে পশিবে না কানে!''

এই দৃশ্যে প্রকৃতিক ঝড় যেন সন্ন্যাসীর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অন্তরের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। এ

বাইরের ঝড় নয় সন্ন্যাসীর অন্তরের ঝড়। পরিপূর্ণ মানসিক উত্তরণের পূর্বে এই দৃশ্যে সন্ন্যাসীর আত্মিক conflict চরম আকার ধারণ করেছে। যেন ভেঙেচুরে যাচ্ছে পুরানো বোধ বা উপলব্ধি। আর অরণ্য সন্ন্যাসীর হৃদয়-অরণ্যের প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে। কেননা সন্ন্যাসী চিত্তবিক্ষোভ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে যে অরণ্যের গভীরে আশ্রয় নিতে চায় সে হৃদয় অরণ্যই। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার জীবনের এই phase কে হৃদয় অরণ্য থেকে নিষ্ক্রমণ বলেছেন। মনে হয় নৈসর্গিক ঝড়কে এভাবে চিত্তবিক্ষোভের প্রতীকী তাৎপর্যে ব্যাবহার করবার শিক্ষা তিনি শেক্সপীয়রের নাটক থেকে গ্রহণ করে থাকবেন।

চতুর্দশ দৃশ্য, 'প্রভাত'। এই দৃশ্যে দেখা যায় সন্ন্যাসীকে অরণ্য থেকে ছুটে বেড়িয়ে আসতে। গতরাত্রির ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধতার পর 'প্রভাত'-এ সন্ন্যাসী উচ্চারণ করে ''যাক, রসাতলে যাক সন্ন্যাসীর ব্রত!'' সমস্ত রাত্রির অন্তর্দ্বন্দ্বের পর নতুন রূপে সন্ন্যাসী আত্মপ্রকাশ করে। একদিকে জাগতিক স্নেহের আকর্ষণ অন্যদিকে ঊর্দ্ধচারী হবার আকাঙ্ক্ষা এই দুই বিপরীত বোধের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত সন্ন্যাসীকে শেষ পর্যন্ত বলতে হয়—

আজ হতে আমি আর নহিরে সন্ন্যাসী!
পাষাণ সংকল্পভার দিয়ে বিসর্জন
আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি একবার!

আর এই উপলব্ধি জাগ্রত হবার পর তার মনে হয় ''আজি এ জগৎ হেরি কী আনন্দময়!'' এই দৃশ্যে সন্ন্যাসীর পরিপূর্ণ উত্তরণ ঘটে। এই উত্তরণ গুহা থেকে পৃথিবীতে, অন্ধকার থেকে আলোতে এবং অমানবিকতা থেকে মানবিকতায়। এরপর পঞ্চদশ দৃশ্যে 'পথে' দেখা যায় সন্ন্যাসীকে। সন্ন্যাসী খুঁজছে বালিকাকে। পথে মানুষের ভীড়। কোন পথিক যখন সন্ন্যাসীকে প্রণাম করতে যাচ্ছে তখন সন্ন্যাসী বলছে ''আমিও যে একজন তোমাদেরই মতো''।

ষোড়শ দৃশ্য, 'গুহামুখ'। এই গুহামুখে দেখা যায় বালিকার মৃত দেহ পড়ে আছে। সন্ন্যাসী তার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে ফিরে এসেছে বালিকার কাছে, ''স্নেহের প্রতিমা ওগো, মা, আমি এসেছি - '' কিন্তু বালিকা তো মৃত্যুবরণ করেছে। এই মৃত্যুর অভিঘাতে সন্ন্যাসীর মনে হয় ''হায় হায় এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ''।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর কাহিনী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসীর জীবনের দুই বোধের দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্যন্ত তার উত্তরণ আমাদের কাছে পরিষ্কার ভাবে ধরা দিয়েছে। একদিকে জীবন ও জগৎ বিবিক্ত সন্ন্যাসী আরেক দিকে সাধারণ মানুষ ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানান কোলাহল এই দুইয়ের মাঝখানে

বালিকা। এই বালিকা মাঝখানে থেকে সন্ন্যাসীর অন্তরে স্নেহ প্রেম পূর্ণ এই জগতের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'র 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' অধ্যায়ে লিখেছেন —

> প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে একদিকে যতসব পথের লোক, যত-সব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, যে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।[৯৪]

সন্ন্যাসী সীমাকে পরিত্যাগ করে অসীমের সাধনায় আত্মনিমগ্ন হয়েছিল এবং প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চেয়েছিল। সন্ন্যাসীর সাধনার পিছনের কারণটি কি? কেন তিনি প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ নিতে চাইলেন? নাটকের শুরুতেই সন্ন্যাসীকে বলতে শোনা গেছে —

> সুখের বিদ্যুৎ দিয়া করিয়া আঘাত
> দুঃখের ঘনান্ধকারে দেছিস ফেলিয়া।
> বাসনারে ডেকে এনে প্রলোভন দিয়ে
> নিয়ে গিয়েছিস মহা দুর্ভিক্ষ-মাঝারে। (১ম দৃশ্য)

এই সুখের বিদ্যুৎ আঘাত এবং বাসনার প্রলোভন থেকে মুক্তি পাবার জন্য সন্ন্যাসীর জীবন-বিচ্ছিন্ন সাধনা এবং এই সাধনার মধ্যদিয়ে তার প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা। বিশ্ব-প্রকৃতি, মানব-প্রকৃতি সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্ন্যাসী আশ্রয় নেয় গুহার অভ্যন্তরে।

> সেই দিন হতে পশি গুহার মাঝারে
> সাধিয়াছি মহাহত্যা আঁধারে বসিয়া। (১ম দৃশ্য)

এখানে 'মহাহত্যা' হচ্ছে মানুষের প্রবৃত্তি গুলিকে হত্যা। সন্ন্যাসীর সাধনা এই ইন্দ্রিয়কে জয় করবার সাধনা। যে মুহূর্তে সে আত্মজয়ী সেই মুহূর্তে পৃথিবী তার কাছে শূন্যবৎ প্রতিভাত হয়েছে। জগৎ যে পৃথক বস্তু নয় তা দ্রষ্টার আত্মনির্মাণ এই ধারণা এখানে প্রকাশ হতে দেখা যায়। কিন্তু সন্ন্যাসীর প্রতিশোধ গ্রহণের কারণটি সঠিক হলেও রাস্তাটি যে ভুল তা প্রমাণিত হয়ে যায়। অভ্যাসের কঠোরতার নির্মম যে চিত্র ছিল 'বাল্মীকি প্রতিভা'তে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'-এ দেখা গেল তারই বিকাশ। অভ্যাসের কঠোরতার আবরণ

ছিন্নকরে দস্যুতা থেকে যেমন বাল্মীকির নিষ্ক্রমণ ঘটে তেমনি সন্ন্যাসীকেও নিষ্ক্রান্ত হতে হয় গুহার অন্ধকার থেকে, অর্জিত কঠোরতার অন্ধকার থেকে মানবিকতার আলোয়। অর্থাৎ নিজের নির্মমতার মধ্যে মানবতাকে ঢেকে রেখে সন্ন্যাসী চেয়েছিল এই প্রাণধর্মকে সাধনায় জয় করতে। দুই নাটকেরই শেষে সেই মানবত্বের উন্মোচন হল। মানুষের স্বাভাবিক মানবত্বকে যে জোর করে অবরুদ্ধ করা যায় না এই পর্বের নাটকগুলিতে তাই দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন -এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—

> এই পালার মধ্যে এই তত্ত্বটুকু পরিস্ফুট যে অন্ত:প্রকৃতি হোক আর বহি:প্রকৃতি হোক তাহাকে নিপীড়ন অথবা প্রত্যাখ্যান করিয়া মানুষ জীবনের দু:খ পরম্পরা এড়াইতে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ নিরপেক্ষ স্বাধীনতা বা আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ করিতে পারেনা। যাহা ''আমি'' নই তাহার সহিত যাহা ''আমি'' তাহার পরিপূর্ণ আপোসেই মানুষের সত্যকার মুক্তি।[৯৫]

সন্ন্যাসী প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিল মানব প্রকৃতিকে, অন্তরের 'স্নেহ প্রেম দয়া' কে ভস্ম করে অন্তরকে করতে চেয়েছিল প্রলয়ের রাজধানী। কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে হয়েছে সেই 'স্নেহ প্রেম দয়া'র কাছেই। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> পরবর্ত্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে- পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।[৯৬]

সন্ন্যাসী সীমাকে প্রত্যাখ্যান করে অসীমের সাধনা করেছিল বলেই সন্ন্যাসী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত সীমার মধ্যেই অসীমের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে তার মুক্তিলাভ ঘটেছে। যে সন্ন্যাসীকে নাটকের শুরুতেই বলতে শোনা গেছে ''এ কী ক্ষুদ্র ধরা! এ কী বদ্ধ চারিদিক!'' সেই সন্ন্যাসীকেই নাটকের শেষে বলতে হয়েছে—

> আখিঁমুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
> অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু! (দশম দৃশ্য)

সীমাকে অস্বীকার কার যে অসীমের সাধনা হতে পারে না সে কথাই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ সন্ন্যাসীর বিভিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ প্রকাশিত তত্ত্বের প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধে, যা লেখা হয়েছিল ১৩১১ সালে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অন্তরের যে প্রকাশ তাহাই আমার কাছে অসীম বিশ্ময়াবহ।''[৯৭]

অথবা -

> পৃথিবীর প্রেমের মধ্যদিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন। -
>
> বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
> অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।...[৯৮]

এই প্রবন্ধেই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'- এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন—

> আমি বালক বয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিয়াছিলাম— তখন আমি নিজে ভালো করিয়া বুঝিয়া ছিলাম কিনা জানিনা— কিন্তু তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া , এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থ ভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি।[৯৯]

সীমা-অসীমের এই স্বরূপ ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথকে পরবর্ত্তীতেও করতে হয়েছিল। আশ্বিন ১৩১৯-এ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হল 'সীমার সার্থকতা' প্রবন্ধ। সেখানে তিনি লিখলেন—

> সীমা আছে একথা যেমন নিশ্চিত, অসীম আছেন একথা তেমনি সত্য। আমরা উভয়কে যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি তখনই আমরা মায়ার ফাঁদে পড়ি।... নিজের সীমার মধ্যেই সেই অসীমকে পাইতে হইবে, ইহা ছাড়া গতি নাই। সীমার মধ্যে অসীমকে ধরে না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আমরা অসীমকে খর্ব করিয়া থাকি।[১০০]

সীমা ও অসীমের এই মিলন সাধনা রবীন্দ্রদর্শনের স্বরূপ। ক্ষুদ্রের মধ্যে, তুচ্ছের মধ্যে বৃহতের সন্ধান , সংসার বিবিক্ত হয়ে নয়, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে জড়িয়ে থেকে মুক্তির অন্বেষণ এই হচ্ছে রবীন্দ্রদর্শনের মূল সুর। এই দর্শনেরই প্রকাশ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে।

রবীন্দ্রনাথের সীমার মাঝে অসীমের অন্বেষার এই দর্শন আমাদের ধারণা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ছোঁয়া দ্বারা অনেকটা নির্মিত এবং আমাদের মনে হয় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটক নির্মাণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির জীবনজাত অভিজ্ঞতার অনেকটাই প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

মহর্ষির আত্মজীবনী গ্রন্থটি আমাদের এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হবে।

১৮৮৬ সালের ১৩ জুলাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে চিঠি লিখে জানাচ্ছেন—

> তিনি (মহর্ষি) তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে যে বই লিখেছেন সেটা পড়ে আশ্চর্য হতে হয়। সেই বইখানি একটি পরিণত মহৎ জীবনে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সেটা পড়লে আমার হৃদয়ে এক প্রকার অনির্দেশ্য আশার সঞ্চার হয়। বাঙ্গালা ভাষায় এই একটি রীতিমত বই লেখা হল।[১০১]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮১৭ থেকে ১৮৫৮-এর নভেম্বর অর্থাৎ তাঁর ১৮ বছর থেকে ৪১ বৎসর বয়স পর্যন্ত সময়কালকে আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই আত্মজীবনীতে উঠে এসেছে বারবার তাঁর সংসার ত্যাগ করার কথা। ১৮৫৬ সালে তিনি চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন। পরমব্রহ্মকে জানার জন্য তাঁর এই আয়োজন। এ প্রসঙ্গে তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

> কোথায় ছিলাম, কেন এখানে আইলাম, আবার কোথায় যাইব অদ্যাপি আমার নিকটে প্রকাশ হইল না; অদ্যাপি এখানে থাকিয়া ব্রহ্মকে যতটা জানা যায়, তাহা আমার জানা হইল না। আর আমি লোকেদের সঙ্গে হো হো করিয়া বেড়াইব না, বৃথা জল্পনা করিয়া আর সময় নষ্ট করিব না। একাগ্র চিত্ত হইয়া একান্ত তাঁহার জন্য কঠোর তপস্যা করিব। আমি বাড়ি হইতে চলিয়া যাইব আর ফিরিব না।[১০২]

কিন্তু এই যাত্রার মধ্য দিয়ে তাঁর মধ্যে এক নতুন বোধের জন্ম হয়। নবলব্ধ এই বোধের কারণেই তাঁকে পুনরায় ফিরে আসতে হয় সংসারে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার দুই বছর পর ১৮৫৮ সালের অক্টোবর মাসে মহর্ষি তখন শিমলায়, আত্মজীবনীতে লিখছেন—

> একদিন আশ্বিন মাসে খাদে নামিয়া একটি নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্ম্মল ও শুভ্র। ইহার জল কেমন স্বাভাবিক ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে, ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জনা ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে। তবে কেন এ সেদিকে প্রবল বেগে ছুটিতেছে? কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার

কি ক্ষমতা? সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইয়াও ভূমি সকলকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামিনী হইতে হইবে। ... এই প্রকার ভাবিতেছি, এসময় হঠাৎ আমি আমার অন্তর্যামী পুরুষের গভীর আদেশবানী শুনিলাম, "তুমি উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্যলাভ করিলে, যাও, পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।"[১০৩]

এরপর মহর্ষি লিখেছেন—

ঈশ্বরের আদেশ, বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া; সে আদেশের বিরুদ্ধে কি মানুষের ইচ্ছা টিকিতে পারে? সে আদেশের বাহিরে একটু ইচ্ছা করিতে গিয়া প্রকৃতি শুদ্ধ বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। এমনি তাহার হুকুম। 'হুকুমে অন্দর সব কোই, বাহব-হুকুম ন কোই।' আর কি আমি শিমলাতে থাকিতে পারি? প্রকৃতিরা তখন আমাকে বলিতেছে, 'এই দুই বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে কত কষ্ট দিলে। কত সাধ্য সাধনা করিলাম, আমাদের একটি নির্দ্দোষ প্রবৃত্তিকেও পরিতোষ করিলে না; এখন আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, আর তোমার শুশ্রূষা করিতে পারি না।' প্রকৃতিরা দুর্ব্বলই হউক আর সবলই হউক, আর কি আমি শিমলাতে থাকিতে পারি?[১০৪]

এরপর ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে মহর্ষি কোলকাতায় ফিরে এলেন। তখন তার বয়স ৪১ বছর। পরমব্রহ্ম লাভের আশায় মহর্ষি সংসার ত্যাগ করে নির্জন প্রকৃতির মাঝে সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পরমব্রহ্ম অসীমেরই ইংগিত করে। এই অসীমকে পাবার আশায় মহর্ষি সীমাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। 'লোকেদের সঙ্গে হো হো' করে না ঘুরে নির্জনতায় তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু সাধনার এই পথ যে ঠিক নয়, ব্রহ্মকে পাবার, অসীমকে ছোঁয়ার এই পন্থা যে ভুল তা প্রমাণিত হতে বেশি সময় লাগেনি। প্রকৃতিই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছে 'নিম্নগামী' হবার জন্য। সীমার মাঝেই অসীমের আরাধনা করবার জন্য, সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কলহের মাঝে ব্রহ্মের উপাসনা করবার জন্য। অন্তর্যামী পুরুষের যে আহ্বান তিনি শুনেছিলেন, "তুমি উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও", সে তো মহর্ষির অন্তর্গত উপলব্ধি। যে প্রকৃতিকে তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন, তাদের একটি 'নির্দোষ প্রবৃত্তিকেও পরিতোষ' করেননি সেই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরমব্রহ্মের উপাসনা যে হতে পারে না নদীর নিম্নগামী হবার দৃশ্যে মহর্ষি তা ভাল ভাবেই উপলব্ধি করেছেন। আর এ কারণেই তাঁকে ফিরতে হয়েছে সংসারে।

এতো রবীন্দ্রনাথের কবিতার জীবনগত উদাহরণ —

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দিরমাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধকরি যোগাসন, সে নহে আমার। (৩০ নং কবিতা / নৈবেদ্য)

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'- এর সন্ন্যাসীও অনন্তের সাধনার জন্য অন্তকে পরিত্যাগ করেছিল। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে গুহার অন্ধকারে যোগাসনে বসেছিল। কিন্তু বালিকা স্নেহ প্রেম ভালবাসা দয়া ইত্যাদি মানবিক বোধের স্পর্শ নিয়ে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসীকে সংসারের মধ্যে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। নাটকের প্রথম দিকে সন্ন্যাসীকে বলতে শোনা গেছে—

পথ দিয়ে চলিতেছে এরা সব কারা!
এদের চিনিনে আমি, বুঝিতে পারিনে
কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল।
কী চায়? কিসের লাগি এত ব্যস্ত এরা? (২য় দৃশ্য)

এ যেন মহর্ষির ''লোকদের সঙ্গে হো হো করিয়া বেড়াইব না''-এর কাব্যিক প্রকাশ। মহর্ষি যেমন তাঁর ভ্রমণ শেষ করে 'নিম্নগামী' হয়ে সংসারের মাঝে, মানুষের মাঝে ফিরে এলেন সন্ন্যাসীও তেমনি তার সাধনা, সাধনায় সিদ্ধিলাভ, বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগের ব্যর্থতা শেষে ফিরে এলেন মানুষের মাঝে, সংসারের মাঝে, সীমার মাঝে —

আমিও যে একজন তোমাদেরই মতো,
তোমাদেরই গৃহ মাঝে নিয়ে যাও মোরে। (পঞ্চদশ দৃশ্য)

মহর্ষির জীবনের সত্য লাভ এবং সন্ন্যাসীর জীবনের সত্য লাভ প্রায় একই উপায়ে সংঘটিত হয় এবং দু'জনের সত্যের স্বরূপও একই। কিন্তু মহর্ষির এই সত্য লাভের পিছনে ঈশ্বরীয় চেতনা কাজ করেছে

প্রবলভাবে কিন্তু 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ঈশ্বর চেতনার নাটক নয়। আবু সয়ীদ আইয়ুব এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ''ঈশ্বর অত্যন্ত লক্ষনীয় ভাবেই অনুপস্থিত এই নাটকে।''[১০৫]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনার ক্ষেত্রে আমরা অনুমান করি রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির জীবন থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে থাকতেও পারেন। যদিও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনার অনেক পর অর্থাৎ ১৮৯৮-এ মহর্ষির আত্মজীবনী প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই প্রকাশের অনেক আগেই যে বইটি লেখা হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। আমরা জানি যে মহর্ষি তাঁর অনুচর প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে এই গ্রন্থের স্বত্বদান করেছিলেন এবং তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ''আমি এই পৃথিবীতে থাকিতে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবে না'' (১১ই মাঘ, ১৮১৬ শক, ১৮৯৩ খ্রী:)। কিন্তু মহর্ষি তাঁর জীবত কালেই গ্রন্থটি প্রকাশের অনুমতি দেন এবং ১৮৯৯ খ্রী:-এ এর প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। ১৮৮৬ সালে প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি টি (যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি) একটু গভীরভাবে পাঠ করলে বোঝা যায় মহর্ষির আত্মজীবনী অনেক আগেই লেখা হয়েছিল এবং তা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর আগেই যে লেখা হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মহর্ষির জীবনজাত সত্য যে রবীন্দ্রনাথকে নাড়া দিয়েছিল প্রবলভাবে সে কথাই প্রকাশ করেছেন প্রিয়নাথ সেনকে চিঠি লিখে, ''সেটা পড়লে আমার হৃদয়ে এক প্রকার অনির্দেশ্য আশার সঞ্চার হয়।''

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনার পিছনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিজীবনের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন 'জীবনস্মৃতিতে'। তিনি লিখেছেন—

> আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময়,অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল - এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটি একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে।[১০৬]

এই ইতিহাস 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনার পূর্বে 'সন্ধ্যাসংগীত' এবং 'প্রভাতসংগীত' কাব্যেও দেখা দিয়েছে। কাব্যের ক্ষেত্রে যেমন 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'প্রভাতসংগীত'-এ উত্তরণ এবং তার মাঝে সদর স্ট্রীটের অভিজ্ঞতার অভিঘাত তেমনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ গুহার আত্মমগ্নতা থেকে বিশ্বজনীনতায় উত্তরণ মাঝে বালিকা এবং তার স্পর্শে আত্মদ্বন্দ্বের রক্তময়তা আর এ সবের মধ্যেই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি।

সুতরাং সীমা-অসীমের এই মিলন সাধনার তত্ত্ব অথবা আত্ম-অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তিলাভের আনন্দ যেমন পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মোপলব্ধির ফলশ্রুতি তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও ব্যক্তিজীবনের আলোক- উদ্ভাসন। পিতার অভিজ্ঞতা এবং নিজ অভিজ্ঞতার মিলিত প্রকাশ আমাদের মতে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটক।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে নাটকে কাহিনীর আবরণে যে তত্ত্ব তিনি প্রকাশ করলেন সেই তত্ত্বই প্রকাশিত হল সমকালে রচিত তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে। যেগুলি ১২৯০-৯১ সালে প্রকাশিত হচ্ছিল 'ভারতী', 'তত্ত্ববোধিনী', এবং 'নবজীবন' পত্রিকায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' তে লিখেছেন—

> তখনো আলোচনা নাম দিয়া যে ছোট ছোট গদ্য প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার একটি তত্ত্ব ব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতল স্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।[১০৭]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর দৃশ্য সংখ্যা ১৬টি। দৃশ্যগুলি সংঘটিত হয়েছে গুহা, পথ, গুহামুখ, অরণ্য এবং পর্বত শিখরে। গুহায় দুটি দৃশ্য, পথে পাঁচটি, গুহামুখে ছয়টি, অরণ্যে একটি, অরণ্যের বাহিরে একটি এবং পর্বত শিখরে একটি। এই দৃশ্য স্থাপনায় প্রতীকী ব্যঞ্জনা রয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। গুহা, পথ, গুহাদ্বার এবং অরণ্য এই চারটি দৃশ্য চার ধরণের প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। গুহা অবরুদ্ধ জীবনের প্রতীক, পথ চলমান জীবনপ্রবাহের প্রতীক, গুহাদ্বার জীবনের অবরুদ্ধতা ও চলমান জীবনপ্রবাহের সঙ্গম স্থলের প্রতীক এবং অরণ্য হৃদয়-অরণ্যের প্রতীক। দৃশ্যপট হিসেবে 'অরণ্য' শুধুমাত্র ত্রয়োদশ দৃশ্যেই দেখা দিয়েছে। এই দৃশ্যটিতে সন্ন্যাসীর অর্ন্তদ্বন্দ্বের চরমতম প্রকাশ দেখা যায়। 'অরণ্য' এখানে সন্ন্যাসীর হৃদয় অরণ্যের প্রতীকী মাত্রা লাভ করেছে। অনুষঙ্গ হিসেবে উঠে এসেছে যে 'ঝড় বৃষ্টি' ও 'রাত্রি' তাও তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। গুহার অবরুদ্ধতার অন্ধকারের মধ্যে সন্ন্যাসী জীবনবিমুখতার তপস্যা করেছে। গুহার অন্ধকার-জীবনহীন জীবনেরই দ্যোতক। নাটকে প্রথম এবং নবম দৃশ্যটি গুহায় সংঘটিত হয়েছে। তবে দুটি দৃশ্যের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে বিস্তর। প্রথম দৃশ্যে সন্ন্যাসী আঁধারে গুহার মাঝে একাকী রয়েছে আর ''অনাদিকালের রাত্রি সমাধিমগনা/ নিশ্বাস করিয়া রোধ পাশে বসে আছে।'' শিলার ফাটল দিয়ে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ছে, প্রাচীন ভেকের দল ঘুমিয়ে রয়েছে,বাদুর অমানিশীথের বার্তা নিয়ে আসছে দূর থেকে। এ সবই জীবন বিচ্ছিন্ন এক অন্ধকার জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। আর এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সন্ন্যাসী প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে চলেছে। কিন্তু তবুও এই জীবন বিবর্জিত অন্ধকার গুহা একেবারেই আলোর যোগসূত্র

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে না। সেখানেও কখনো কখনো গুপ্তচরের মতো আলোর প্রবেশ ঘটে—

কখনো বা কোনদিন কে জানে কেমনে
একটি আলোর রেখা কোথা হতে আসে,
দিবসের গুপ্তচর রজনীর মাঝে
একটুকু উঁকি মেরে যায় পালাইয়া।

আলোর ইশারা যেন ভবিষ্যতের সম্ভবনার এই ইংগিত দিয়ে যায় যে এই গুহার গূঢ় অন্ধকার একদিন অপসৃত হবে। নাটকের শুরুতেই যেন নাটকের পরিণতির আভাস মেলে। গুহাতো সন্ন্যাসীর অন্তর্লোকের পরিচয় জ্ঞাপক । যে অন্তর অসত্যের অন্ধকারে পূর্ণ। সেখানে একদিন আলোর প্রদীপ জ্বলে উঠবে। তারই আভাস মিলে যায় এই উঁকি মেরে যাওয়া আলোর ইশারায়। রবীন্দ্রনাট্যে নেতির কোন স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে শ্রী ভূদেব চৌধুরীর মন্তব্য, ''মানুষের পরিণাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কখনো সংশয় রাখেননি শেষ পর্যন্ত — রঞ্জনের প্রাণহীন দেহের সামনে তাই নন্দিনীর অবিচলিত অঙ্গীকার - সে 'ফিরে আসবে' —।''[১০৮]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর প্রথম দৃশ্যে যে আলোর রেখা উঁকি মেরেছিল সন্ন্যাসীর গুহাময় অন্তর্লোকে সেই আলোক রেখাই ক্রমাগত বেড়ে চলে এবং সন্ন্যাসীকে গুহা থেকে পথ, পথ থেকে গুহায় তাড়িয়ে ফেরে। এবপর সন্ন্যাসীকে আর একবার মাত্র গুহায় প্রবেশ করতে দেখা যায় নবম দৃশ্যে। এর মধ্যে দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে অষ্টম দৃশ্য পর্যন্ত নাট্য-ঘটনা পথ এবং গুহা দ্বারে সংঘটিত হয়েছে ও সন্ন্যাসী ক্ষতবিক্ষত হয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্বে। একারণেই প্রথম দৃশ্য এবং নবম দৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য ঘটে যায় অনেকটাই। প্রথম দৃশ্যের মতো নবম দৃশ্যে সন্ন্যাসীর মধ্যে দেখা যায় না কাঠিন্য এবং এখানে, গুহার অন্ধকারে আলোর রেখা শুধু উঁকি মেরে চলে যায় না। বালিকা প্রদীপ হাতে সরাসরি ঢুকে পড়ে গুহার মধ্যে। অন্ধকার গুহা আলোয় আলোকময় হয়ে ওঠে। বালিকা যেন জীবনের সত্যময় আলোক বর্তিকা নিয়ে ঢুকে পড়ে সন্ন্যাসীর জমাট বাঁধা অন্ধকার অন্তর্গুহায়। (মনে পড়ে 'রক্তকরবী' নাটকের নন্দিনীর সংলাপ, ''তোমাদের সুড়ঙ্গের ওই অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তারমধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।'') বালিকার এই আলোক প্রক্ষেপণের কারণে সন্ন্যাসীকে বলতে হয়—

সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি,
সহসা জগৎ হতে কে তোরে পাঠালে?
সেথা হতে সাথে করে কেন নিয়ে এলি

দিবালোক, পুষ্পগন্ধ, স্নিগ্ধ সমীরণ? ...
সরলতাময় তোর মুখ খানি দেখে
জগতের পরে মোর হতেছে বিশ্বাস। ...
চল বাছা গুহা হতে বাহিরেতে যাই।
সমুদ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ,
সমুদ্রের পরপারে আমি বসে আছি,
মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী —
জগৎ-অতীত এই পারাবার হতে
মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কূলে।

এরপর সন্ন্যাসীকে আর গুহায় ফিরতে দেখা যায়নি। যদিও সন্ন্যাসীর অন্তর্গুহার অন্ধকার পুরোপুরি দূর হওয়ার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয় চতুর্দশ দৃশ্য পর্যন্ত কিন্তু বালিকার দায়িত্ব সে এরই মধ্যে সম্পন্ন করে ফেলে। অন্ধকারের মধ্যে সত্যের আলো ছড়িয়ে দিয়ে, 'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ' ভেঙে দিয়ে বালিকা সন্ন্যাসীর অন্তরে সত্যবোধ জাগিয়ে দেয়। আর একারণেই বালিকা চরিত্রটিও প্রতীকী মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ যেন 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সরস্বতী বেশধারী বালিকার উত্তরসূরী এবং 'বিসর্জন'-এর অপর্ণা ও 'রক্তকরবী'-এর নন্দিনীর পূর্বসূরী।

রবীন্দ্রনাট্যে দৃশ্যপট হিসেবে 'পথ'-এর প্রয়োগ একটি বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ মন্তব্য করেছেন, ''বস্তুত রবীন্দ্ররচনায় 'পথ' যে ভাবে ব্যবহৃত, তার ভঙ্গি ত্রিমুখী। কখনো তা আসে নিছক দৃশ্যপট হিসেবে, কখনো তা নাটকের বিষয়ও বটে, আবার কখনো প্রতীক: পটই হয়ে ওঠে বিষয়ের প্রতীক।''[১০৯]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকেই 'পথ'-এর এই ত্রিমাত্রিক প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে আমরা 'রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায়ে পরিণত পর্যায়ের বীজানুসন্ধান' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ দৃশ্য পট হিসেবে 'গুহাদ্বার' জীবনের অবরুদ্ধতা এবং চলমান জীবনের সঙ্গমস্থলের প্রতীক হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—

গুহাদ্বার, গুহা ও জগতের মিলনস্থল। একদিকে গুহা জগৎ বর্জিত, নিরালম্ব
অসীমের ধ্যানের স্থিতি, অন্যদিকে জগতের ও জীবনের স্নেহ-প্রেম-সৌন্দর্য-

মাধুর্যের আকর্ষণ, এই উভয়ের সংগম স্থলে গুহাদ্বারের অবস্থিতি। সন্ন্যাসীর অন্তর্দ্বন্দ্বের উভয়পক্ষ সীমা ও অসীম এই দ্বারে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া।[১১০]

'গুহাদ্বার'-এর দৃশ্য গুলি আলোচনা করলে এই মন্তব্যের যথার্থতা প্রতিপন্ন হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ গুহাদ্বারেব দৃশ্য ছয়টি।

এক.	পঞ্চম দৃশ্য	-	গুহাদ্বার।
দুই.	ষষ্ঠ দৃশ্য	-	গুহাদ্বার।
তিন.	অষ্টম দৃশ্য	-	গুহাদ্বার।
চার.	দশম দৃশ্য	-	গুহার বাহিরে।
পাঁচ	দ্বাদশ দৃশ্য	-	গুহাদ্বার।
ছয়.	ষোড়শ দৃশ্য	-	গুহামুখ।

এই ছয়টি দৃশ্যের মধ্যে দশম দৃশ্য ছাড়া বাকী পাঁচটি দৃশ্যে সন্ন্যাসী ও বালিকার উপস্থিতি রয়েছে। সন্ন্যাসী 'জগৎ বর্জিত, নিরালম্ব অসীমের' সাধক এবং বালিকা 'জগতের ও জীবনের স্নেহ-প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্যের আকর্ষণ'। একজন 'গুহা' অন্যজন 'পথ' (মনেপড়ে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয় প্রতাপাদিত্যকে বলেছিল, ''মহারাজ রাজ্যটাও তো রাস্তা -''৪/৭)। দুই-এর অবস্থান তাই গুহাদ্বার। যে গুহাদ্বারে 'পথ' ও 'গুহা'র দ্বন্দ্ব, মুক্তি ও জড়ত্বের দ্বন্দ্ব, আলো ও আঁধারের দ্বন্দ্ব। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ 'গুহাদ্বার' তাই প্রতীকের পরমার্থতা লাভ করে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর দ্বন্দ্ব মূলত 'গুহা' ও 'পথ'-এর দ্বন্দ্ব। তাই গুহাদ্বার-এর পটভূমিতে উচ্চারিত সন্ন্যাসীর সংলাপে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে গুহাদ্বারের দৃশ্যগুলি থেকে সন্ন্যাসীর কিছু সংলাপ উদ্ধৃত করে সন্ন্যাসীর অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

এক. তবে থাক, তবে তুই কাছে আয় মোর।
দেখি তোর অতিমৃদু স্পর্শ সুকোমল।
আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন—
সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে।
এ কি মায়া? এ কি স্বপ্ন? এ কি মোহ ঘোর?
জগৎ কি মায়া করে ছায়া হয়ে গিয়ে
করিছে প্রাণের কাছে অনন্তের ভান? (পঞ্চম দৃশ্য)

দুই. দূর হোক — এ-সকল কিছু ভাল নয়—
বালিকা, বালিকা তোর এ কী ছেলে খেলা!
আমি যে সন্ন্যাসী যোগী মুক্ত নির্বিকার,
সংসারের গ্রন্থিহীন, স্বাধীন সবল,
এ ধুলায় ঢাকিবি কি আমার নয়ন! (ষষ্ঠ দৃশ্য)

তিন. এ কী অন্ধকার হেথা! এ কী বদ্ধ গুহা!
আয় বাছা, মোরা দোহে বাহিরেতে যাই,
চাঁদের আলোতে গিয়ে বসি একবার।...
আজিও ডাকিস মোরে! আমি ফিরিব না।
বন্দী করে রেখেছিলি মায়া মুগ্ধ করে,
পালায়ে এসেছি আমি, হয়েছি স্বাধীন।...
এ কী রে চলিছি কোথা, এসেছি কোথায়!
বুঝি আর আপনারে পারিনে রাখিতে।
বুঝি মরি, ডুবি, বুঝি লুপ্ত হয়ে যাই। (৮ম দৃশ্য)

চার. জগৎ-চক্রের মাঝে যেতেছি পড়িতে—
চারিদেকে জড়াইছে অশ্রুর বাঁধন,
প্রতিদিন কমিতেছে চরণের বল।...
যাক্ ছিঁড়ে! গেল ছিঁড়ে! চল ছুটে চল! (দশম দৃশ্য)

পাঁচ. আকাশ বিহারী পাখি উড়িত আকাশে -
মাটি হতে ব্যাধ তারে মারিয়াছে বাণ,
ক্রমেই মাটির পানে যেতেছে পড়িয়া—
ক্রমেই দুর্বল দেহ, শ্রান্ত ভগ্ন পাখা,
ক্রমেই আসিছে নুয়ে অভ্রভেদী মাথা।...
এখনো হইব জয়ী ছিঁড়িব শৃঙ্খল। (দ্বাদশ দৃশ্য)

ষোড়শ দৃশ্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর শেষ দৃশ্য। বালিকার মৃত দেহ 'গুহামুখ'-এর ধুলায় পড়ে আছে। আত্মিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসীর মানসিক উত্তরণ সম্পন্ন হওয়ার পর সন্ন্যাসী ফিরে এসেছে বালিকার কাছে। কিন্তু বালিকা তো বেঁচে নেই। বালিকার মৃত দেহ স্পর্শ করে সন্ন্যাসী বলছে—

নয়ন-আনন্দ মোর, হৃদয়ের ধন;
স্নেহের প্রতিমা ওগো, মা, আমি এসেছি—
ধুলায় পড়িয়া কেন - ওঠ মা ওঠ মা—
পাষাণেতে মুখ খানি রেখেছিস্ কেন? ...
বাছা, বাছা কোথা গেলি ! কী করিলি রে—
হায়, হায়, এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ!

লক্ষ করবার বিষয় যে বালিকার মৃত্যুর স্থানটি গুহা মুখ। বালিকা যেন তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসীকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল তোমার ঐ গুহা মিথ্যা। মানুষের মুক্তি অন্ধকারের অবরুদ্ধতায় নয়, মুক্তি আলোকময় উন্মুক্ততার মধ্যে। মানব প্রকৃতি এবং বিশ্ব প্রকৃতিকে অবহেলা করলে প্রকৃতি 'নিদারুণ প্রতিশোধ' গ্রহণ করে।

রবীন্দ্রনাটকে জনতা চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় এই জনতা চরিত্রের "মূঢ়তা ও ভীরুতা, এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধি তাহার প্রধান লক্ষণ"[১১১]। 'রুদ্রচন্ড' নাটকে যদিও 'নাগরিকগণ' হিসেবে জনতা চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে কিন্তু তারা রবীন্দ্রনাটকের বিশিষ্ট জনতা চরিত্র নয়। এই বিশিষ্ট জনতা চরিত্রের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে।

ঙ. গদ্যনাটক 'নলিনী' ও গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রকাশের দশদিন পর প্রকাশিত হয় গদ্যনাটক 'নলিনী'। প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, "বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশ তারিখ 10 May 1884 [শনি ২৯ বৈশাখ]"।[১১২] 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর মত একটি তত্ত্বমূলক নাটক রচনার পর 'নলিনী'র মত একটি 'অকিঞ্চিৎকর'[১১৩] নাটক রবীন্দ্রনাথ কেন লিখতে গেলেন? আসলে 'নলিনী' রচিত হয়েছিল অভিনয়ের তাগিদ থেকে। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

যৌথ-রচনা বিবাহ-উৎসবের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া তরুণ-তরুণীরা স্থির করিলেন যে নাটকের রচয়িতা হইবেন অভিনেতারা স্বয়ং। সেই জন্য মোটামুটি

> ভাবে একটা প্লট খাড়া করিয়া অভিনয়ের অংশ নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল। একজন নিজ অংশ লিখিয়া দিলে অপরজন তাঁহার অংশ লিখিবেন, এইরূপে অভিনেতা-লেখকদের হাতে-হাতে ঘুরিয়া একটা জিনিস খাড়া হইল বটে, তবে তাহাকে সাহিত্য নাম দেওয়া যায় না। নাটক রচনা এভাবে বারোয়ারি সমবায়-পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হয় না শেষকালে রবীন্দ্রনাথকেই সেই খসড়া ছাঁটিয়া কাটিয়া একটা চলন সই নাটক খাড়া করিতে হইল। নাটকখানির নাম রাখা হইল 'নলিনী', রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নাম।[১১৪]

অভিনয়ের কারণে 'নলিনী' রচিত হলেও শেষ পর্যন্ত তা অভিনীত হয়নি।

'নলিনী' ছয়টি দৃশ্যের একটি নাটিকা। এর কাহিনীর উপাদান সংগৃহীত হয়েছে 'ভগ্নহৃদয়' থেকে। 'নলিনী'তে রয়েছে দুটি পুরুষ চরিত্র নীরদ ও নবীন, দুটি নারী চরিত্র নলিনী ও নীরজা এবং একটি বালিকা চরত্র ফুলি। নীরদ নলিনীকে তার ভালবাসার কথা বলেছিল কিন্তু নলিনী তার অন্তরের কথা নীরদের কাছে প্রকাশ করতে পারেনি। নীরদ নলিনীকে ভুল বোঝে, নলিনীকে তার স্বার্থপর মনে হয়। একারণে ক্ষোভে অভিমানে নীরদ বিদেশ চলে যায়। বিদেশে গিয়ে সে নীরজাকে ভালবাসে এবং দু'জনের বিয়ে ঠিক হয়। এদিকে নীরদ চলে যাওয়ার পর থেকে নলিনীর জীবনও যায় বদলে। নলিনী আর বাগানে বেড়াতে যায় না, ফুল তুলতে যায় না। নীরদ নলিনীর শুধু বাইরেটাই দেখেছিল, অন্তরের পরিচয় নিতে পারে নি। আর এ কারণেই দু'জনের মধ্যে রচিত হয়েছে বিচ্ছেদ। নীরদ ও নলিনীর সমস্যা প্রকাশ-অপ্রকাশের সমস্যা। নীরদের সঙ্গে নীরজার সম্পর্ক তৈরী হলেও নলিনীর প্রতি নীরদের এক অন্তর্গত আকর্ষণ ছিল। একারণেই নীরজার মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, 'আমাদের এ বাসর ঘর শ্মশানের উপর গড়া নয়তো।' তবে এই জটিলতা তীব্রতা লাভের আগেই নলিনীর ক্ষীয়মান রুগ্ন শরীর দেখে নীরজা নীরদ ও নলিনীর মিলন ঘটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শেষ দৃশ্যে নীরজার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নলিনী ও নীরদের মিলনের পথ সুগম হয়। 'কবি কাহিনী 'তে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন 'মানুষেরই মন চায় মানুষের মন'। 'নলিনী' এই মনে মনে মিলনের নাটক। রবীন্দ্রনাট্য চর্চার প্রথম পর্যায়ে 'নলিনী' সবচেয়ে দুর্বল রচনা। বিষয় বস্তুগত দিক থেকে এই নাটকটি কাহিনী কাব্যগুলির উত্তরসূরী। রবীন্দ্র নাট্যথীমের কোন বিশেষত্ব এখানে প্রকাশ পায়নি। আঙ্গিকগত দিক থেকেও বিশ্লেষণ করলে এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাট্যরীতির কোন আভাস মেলে না।

'নলিনী' নাটক থেকেই উঠে এসেছে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের কাহিনী। 'মায়ার খেলা' নাটকের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''আমার পূর্ব রচিত একটি আকঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার

সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।''[১১৫] তবে 'মায়ার খেলা'-এর বীজ পোঁতা হয়েছিল অনেক আগেই। আমাদের ধারণা 'ভগ্নহৃদয়' হচ্ছে সেই বীজ যা 'নলিনী'কে ছুঁয়ে 'মায়ার খেলা'য় অঙ্কুরিত হয়েছে।

'মায়ার খেলা' ও রচিত হ'ল অভিনয়ের প্রয়োজনে। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিষ্ঠিত 'সখি সমিতি'র অনুষ্ঠানে অভিনয়ের জন্যে সরলা রায়ের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' রচনা করেন। 'মায়ার খেলা'র রচনা কবে শেষ হয়েছিল এপ্রসঙ্গে কিছু জানতে না পারলেও আমরা জানি যে 'মায়ার খেলা'র রচনার সূত্রপাত হয়েছিল দার্জিলিং-এ। রবীন্দ্রনাথ ১২৮৯-এর কার্তিক মাসে দার্জিলিং গিয়েছিলেন, সেই সময়ে 'মায়ার খেলা'র সূচনা হয়। দার্জিলিং থেকে কোলকাতায় ফিরে এসেও 'মায়ার খেলা'র রচনার কাজ চলতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী লিখেছেন, ''এখনো মনে পড়ে আমাদের পার্কস্ট্রীটের বাড়ির তেতালার ঘরে রবিকাকা একটা একহারা খাটে উপুড় হয়ে পড়ে বুকে বালিশ দিয়ে স্লেটের উপর মায়ার খেলার গান লিখছেন এবং গুনগুন করে সুর দিচ্ছেন।''[১১৬]

'মায়ার খেলা'র প্রকাশ তারিখ সম্পর্কে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, ''বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকা অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 22 Dec 1888 [শনি ৮ পৌষ]...।''[১১৭] এর কিছুদিন পর অর্থাৎ ২৯ ডিসেম্বর 'মায়ার খেলা' অভিনীত হয়।[১১৮]

'মায়ার খেলা'র সংক্ষিপ্ত কাহিনী নাট্যকার নাটকের শুরুতেই উল্লেখ করেছেন, ''নতুবা বিচ্ছিন্ন গানের মধ্যে হইতে ইহার আখ্যান সংগ্রহ করা সহসা পাঠকদের পক্ষে দুরূহ বোধ হইতে পারে।''[১১৯] সাতটি দৃশ্যে 'মায়ার খেলা'র কাহিনী বিন্যস্ত। 'মায়াকুমারীগণ' মায়াজাল রচনা করে 'নরনারীর হিয়া'কে 'মায়া পাশে' আবদ্ধ করে। এই মায়া পাশে আবদ্ধ হয়ে অমরের অন্তরে প্রেমাকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। প্রেমাষ্পদের সন্ধানে তাই অমর বেরিয়ে পড়ে। এদিকে শান্তা মন-প্রাণ দিয়ে অমরকে ভালবাসে কিন্তু অমর শান্তার হৃদয়ের ভাষা পড়তে পারেনি। তাই 'মায়াকুমারীগণ' গেয়ে ওঠে—

কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দুরে যাও! (২য় দৃশ্য)

আরেক দিকে প্রমদা সখীদের সঙ্গে আনন্দ করে সময় অতিবাহিত করে। সে 'ভগ্নহৃদয়'-এর নলিনীর মত সব কিছুই খেলার ছলে পুলক রসে ভরিয়ে দিয়ে অহংকারের আবরণে জড়িয়ে রাখে নিজেকে। কুমার ও অশোক প্রমদার প্রণয় প্রার্থী কিন্তু প্রমদা কাউকেই ধরা দেয় না। প্রমদা বলে—

কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই।
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে,

আমি শুধু বহে চলে যাই।

পরশ পুলক রস - ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা। (৩য় দৃশ্য)

অমর ঘুরতে ঘুরতে একদিন প্রমদার কাননে চলে আসে। অমরকে দেখে প্রমদার অন্তরে ভালবাসা জেগে ওঠে। সে সখীদের বলে—

যা, তোরা যা সখী, যা শুধাগে

ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে। (৪র্থ দৃশ্য)

এসময় 'মায়াকুমারীগণ' গেয়ে ওঠে—

প্রেম পাশে ধরা পড়েছে দুজনে

দেখো দেখো সখী, চাহিয়া— (৪র্থ দৃশ্য)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমর আর প্রমদার মিলন ঘটে না। অমর ফিরে যায় শান্তার কাছে। প্রমদা হয়ে পড়ে একা। তাকে বলতে হয়—

কেন এলিরে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলিনে!

কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলিনে। (৭ম দৃশ্য)

প্রমদার এই একাকিত্ব তার অহংকারেরই ফলশ্রুতি। প্রমদাকে উদ্দেশ্য করে কুমার বলেছিল—

তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারিনে,

তুমি গঠিত যেন স্বপনে। (৩য় দৃশ্য)

ধরা না দেয়ার খেলাই যেন প্রমদার অহংকার। তার অহংকারের প্রকাশ হয় এভাবেই—

আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সৌরভে সারা

যেন আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি। (৪র্থ দৃশ্য)

কিন্তু এই অহংকার চূর্ণ হতে সময় লাগেনি। একসময় প্রমদাকে বলতে হয়েছে —

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল,

শুধাইল না কেহ।

সে তো এল না, যারে সঁপিলাম

এই প্রাণমন দেহ। (৫ম দৃশ্য)

'মায়ার খেলা' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারেনি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী।"[১২০] প্রমদার অহংকারই প্রমদাকে গন্ডিবদ্ধ করে রেখেছিল। আত্মসুখে নিমজ্জিত হতে চেয়েছিল বলেই প্রমদার প্রেম মেলেনি, তাকে একাকিত্বের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। মায়াকুমারীগণের গানেই প্রেমের এই সত্যস্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে, "এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না/ শুধু সুখ চলে যায়—।" এই গীতিনাট্যের আরেক দিকে অমরের সঙ্গে শান্তার মিলন হয়। কিন্তু এই মিলনের আগে অমরও কাছের জিনিসকে চিনতে পারেনি। সে শান্তার প্রেম বুঝতে না পেরে 'মায়ার তরণী'তে 'মায়াপুরীপানে' যাত্রা করেছিল। এ সময় মায়াকুমারীগণ গেয়ে ওঠে—

কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।
মনের মত কারে খুঁজে মর,
সে কি আছে ভুবনে, সে তো রয়েছে মনে।
ওগো মনের মতো সেই তো হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও। (২য় দৃশ্য)

সীমাকে অস্বীকার করে যে অসীমের সাধনা হতে পারে না এ যেন তারই প্রকাশ। অমরকে শেষ পর্যন্ত কাছের জিনিসের কাছেই ফিরতে হয়েছে, সীমার মাঝেই ফিরতে হয়েছে। 'মায়ার খেলা'র মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমের তত্ত্বই প্রকাশ করেছেন। পুলিন দাস-এর ভাষায় এই তত্ত্ব হচ্ছে, "আত্মসুখ পরায়ণ প্রেমে বন্ধন আছে, মুক্তি নাই।"[১২১] আত্মসুখের অহমিকা নয় আত্মসমর্পণের মাঝেই আছে প্রেমের মুক্তি।

'মায়ার খেলা' সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, "বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ।"[১২২] এখানে গানই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা মনে করি এই 'মায়ার খেলা'তেই রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রতিভার প্রথম সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

চ. 'রাজা রানী' ও 'বিসর্জন'

'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের স্বরূপ কি হওয়া উচিত তা উপস্থাপন করেছেন। আত্মসুখের জন্য প্রেম প্রার্থনা করলে প্রেম মেলে না এই তত্ত্বই 'মায়ার খেলা'য় মায়াকুমারীগণের গানের

মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম,
প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায়।

প্রেম বিষয়ক এই ভাবনাই সম্প্রসারিত হল রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাঁচ অঙ্কের নাটক 'রাজা ও রানী'-তে। এর প্রকাশকাল সম্পর্কে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, ''বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী নাটকটির প্রকাশের তারিখ 9 Aug [শুক্র ২৫ শ্রাবণ...]''।[২২৫] 'রাজা ও রানী' লেখা হয়েছিল সোলাপুরে। এপ্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, ''ফাল্গুন, চৈত্র ১২৯৫ ও বৈশাখ ১২৯৬-এর প্রথম দিকটা রবীন্দ্রনাথ সোলাপুরে ছিলেন।...এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর প্রথম বড়ো নাটক 'রাজা ও রানী' লেখেন।[২২৬]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম শেক্স্পিয়রীয় রীতিতে পাঁচ অংকের নাটক লিখলেন। এর কাহিনী হচ্ছে কাশ্মীরের রাজকন্যা সুমিত্রা জলন্ধরের রাজা বিক্রমদেবের স্ত্রী। বিক্রমদেব রাজকার্য পরিত্যাগ করে অন্তঃপুরে রাণীর কাছেই সময় অতিবাহিত করেন। রাজার এই দুর্বলতার সুযোগে রাণীর আত্মীয় স্বজনরা রাজ্যে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নেয় এবং তাদের অত্যাচারে সাধারণ প্রজা জর্জরিত হয়ে পড়ে। একারণেই প্রজা বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দেয়। কিন্তু রাজার এসবে ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি অন্তঃপুরে রাণীর সঙ্গে প্রেম লীলায় মত্ত। তিনি রাণীকে বলেন—

থাক্ গৃহকাজ।
সংসারের কেহ নহ অন্তরের তুমি।
অন্তরে তোমার গৃহ, আর গৃহ নাই-
বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ। (১ম অ/২য় দৃ)

কিন্তু রাণী সুমিত্রা রাজার এই সর্বগ্রাসী প্রেম মেনে নিতে পারে না। সে রাজাকে বলে, 'অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী'। আরও স্পষ্ট উচ্চারণ শোনা যায় রাণীর কণ্ঠে, ''আমারে বেসোনা ভালো রাজশ্রীর চেয়ে''। রাণী রাজাকে অনুরোধ করে তিনি যেন প্রজা পীড়কদের রাজ্য থেকে দূর করে দেন। কিন্তু প্রজা পীড়করা তো সবাই রাণীর আত্মীয়। বিক্রমদেব কারো সঙ্গে বিরোধে জড়াতে চান না, তিনি শুধু চান প্রেয়সীর প্রেমে আত্মনিমগ্ন থাকতে। প্রজা পীড়করা যখন বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয় তখন বিক্রমদেব তাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠানোর কথা ঘোষণা করেন। রাজার এই পরিকল্পনায় রাণী অপমানিত বোধ করে। তার মনে হয়, 'ধিক্ আমি, এ রাজ্যের রানী'! একারণেই সুমিত্রা আপন কর্তব্য বলে যাত্রা করলো কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে।

সেখানে ভাই কুমারসেনের সাহায্য নিয়ে রাজ্যের বিদ্রোহ দমন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। এদিকে রাজ্য ছেড়ে রাণীর চলে যাওয়ার কথা শুনে বিক্রমদেবের মোহভঙ্গ হল। প্রেম পরিণত হল প্রতিহিংসায়। তিনি আদেশ দিলেন—

> সৈন্যদল করহ প্রস্তুত। যুদ্ধে যাব,
> নাশিব বিদ্রোহ। (২য় অ/৪র্থ দৃ)

রাণী সুমিত্রা ভাই কুমারসেনের সাহায্য নিয়ে বিদ্রোহীদের বন্দী করে বিক্রমদেবের শিবিরে নিয়ে আসে। কিন্তু বিক্রমদেব রাণীকে তার শিবিরে প্রবেশ করতে দিলেন না। তার অন্তরে ধ্বংসের আগুন জ্বলে উঠেছে, জ্বলে উঠেছে হিংসার আগুন—

> এ প্রবল হিংসা ভালো, ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে,
> প্রলয় তো বিধাতার চরম আনন্দ।
> হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধন মুক্তির।
> সুখ। হিংসা জাগরণ। হিংসা স্বাধীনতা। (৪র্থ অ/ ৫ম দৃ)

এই হিংসার আগুনের তাড়নায় বিক্রমদেব কুমারসেনকে বন্দী করার জন্য কাশ্মীর পর্যন্ত অভিযান করেন। কুমারসেন এবং সুমিত্রা অরণ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কুমারসেনকে না পেয়ে বিক্রমদেব সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালান, নগরে আগুন লাগিয়ে দেন। বিক্রমদেবের অত্যাচার থেকে সাধারণ মানুষদের বাঁচানোর স্বার্থে কুমারসেন আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় কুমারসেন ধরা দেয় না। সে আত্মঘাতী হয় এবং রাণী সুমিত্রা কুমারসেনের ছিন্ন মুন্ড বিক্রমদেবের কাছে নিয়ে আসে এবং নিজে মৃত্যু বরণ করে। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই রাজা বিক্রমদেবের প্রতিহিংসার আগুন নির্বাপিত হয়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি 'মায়ার খেলা'য় প্রেমের যে স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে 'রাজা ও রানী'তে তাই সম্প্রসারিত হল। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সঙ্গেও 'রাজা ও রানী'র সাদৃশ্য রয়েছে। একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য 'রাজা ও রানী'র সূচনা অংশ থেকে উদ্ধারযোগ্য।

> প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে 'রাজা ও রানী'র এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে তা হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তা নয়। এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ

পাবার জন্যে স্বত উদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি যোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম,
প্রেম মেলে না।
শুধু সুখ চলে যায়
এমনি মায়ার ছলনা।[১১৩]

বিক্রমদেব সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করেছিলেন, নিজ কর্তব্য অবহেলা করে আত্মসুখে নিমগ্ন হয়েছিলেন বলেই দেখা দিল বিপর্যয়।

বিক্রমদেবের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে দু'ভাবে। রাণী সুমিত্রা যখন রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে কাশ্মীরে চলে যায় তখন বিক্রমদেবের আত্মমগ্নতার ঘোর যায় কেটে। হৃদয়ে জন্ম নেয় প্রতিহিংসা। তাঁর মনে হয়—

একি মুক্তি! একি পরিত্রাণ! কী আনন্দ
হৃদয় মাঝারে! অবলার ক্ষীণ বাহু
কী প্রচন্ড সুখ হতে রেখেছিল মোরে
বাঁধিয়া বিবর মাঝে! ... (৪র্থ অ/১ম দৃ)

এই বিবর থেকে বেরিয়ে এসে মনে হয় মুক্তি পাওয়া গেল। কিন্তু এতো প্রকৃত মুক্তি নয়। এ প্রতিহিংসার লেলিহান অগ্নিশিখা। কিন্তু প্রকৃত মুক্তির জন্য বিক্রমদেবকে দিতে হয়েছে চরম মূল্য। যখন রাণী সুমিত্রা তাঁর সামনে কুমার সেনের ছিন্ন মুন্ড নিয়ে উপস্থিত হয় এবং নিজে মৃত্যু বরণ করে। এই তীব্র আঘাতেই বিক্রমদেবের সত্যকার মুক্তি অর্থাৎ উত্তরণ সাধিত হয়। নির্বাপিত হয় হিংসার লেলিহান শিখা। তাই বিক্রমদেবকে শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করতে হয়—

দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলেনা? রেখে
গেলে চির অপরাধী করে? ইহ জন্ম
নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারও দিলে না অবকাশ?

দেবতার মত তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দন্ড, কঠিন বিধান! (৫ম অ/ ৯ম দৃ)

'রাজা ও রানী'তে 'পথ'-এর দৃশ্য আছে দুইটি। প্রথম অঙ্ক/ দ্বিতীয় দৃশ্য 'রাজপথ'। এই 'রাজপথ' 'লোকারণ্য'। বিক্রমদেবের উদাসীনতায় বিদেশীরা সাধারণ প্রজাদের উপর অত্যাচার শুরু করেছে। প্রজারা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য একজোট হয়েছে রাজপথে। তারা বিদ্রোহ করতে চায় কিন্তু রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ দেবদত্ত যখন তাদের বোঝায় 'কান্নাই তোমাদের অস্ত্র' তখন তারা তাকেই সত্য বলে মনে করে। রবীন্দ্রনাটকের বিশিষ্ট জনতা চরিত্রের প্রকাশ এই দৃশ্যটিতে দেখা যায়। নির্বুদ্ধিতা যাদের বৈশিষ্ট্য এবং যারা অপরের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'পথ' কোন প্রতীকী মাত্রায় প্রকাশ পায় না। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য কাশ্মীর, প্রাসাদ সম্মুখে রাজপথ। এই দৃশ্যে দেখা যায় দু'জন সৈনিককে যারা কুমার সেন কবে রাজা হবে এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে। এছাড়া রয়েছে কুমারের বৃদ্ধ ভৃত্য শংকর। পুরুষবেশী রাণী সুমিত্রাকেও দেখা যায় এই দৃশ্যে। এই দৃশ্যের পথও কোন প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে না। এছাড়া পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটি সংঘটিত হচ্ছে 'হাট'-এ। এই হাট-এ রয়েছে 'লোক সমাগম'। শ্রী প্রমথ নাথ বিশী রবীন্দ্রনাটকের pattern সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন এই দৃশ্যটি তা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বলেছেন, ''শেষ পর্যন্ত যে pattern বা কাঠামোয় তিনি উপনীত হইয়াছেন তা একটি মেলা ও মেলাটির নিকটবর্তী একটি পথ।''[১১৬] কিন্তু এই একটি মাত্র দৃশ্যের দ্বারা প্রমাণ করা যায় না যে 'রাজা ও রানী' নাটকে রবীন্দ্রনাটকের নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে। জনতা চরিত্র, নাটকে দৃশ্যপট হিসেবে পথের প্রয়োগ ইত্যাদি দু'একটি ছোট-খাটো আভাস থাকলেও 'রাজা ও রানী' শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতিতেই লেখা। কিন্তু নাটকের যে বিষয়বস্তু তা পুরোপুরিভাবেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। যেখানে রয়েছে বন্ধন মুক্তির কথা।

বিসর্জন

'রাজা ও রানী'র মত পাঁচ অঙ্কের শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতিতে রচিত হল 'বিসর্জন'। 'বিসর্জন'-এর প্রকাশকাল এবং এর বিভিন্ন সংস্করণ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন—

> বিসর্জন প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে [২ জ্যৈষ্ঠ]। প্রথম সংস্করণের পাঁচটি অঙ্ক ও ঊনত্রিশটি দৃশ্য ছিল। ১৩০৩ আশ্বিনের 'কাব্যগ্রন্থাবলী' সংস্করণে নাটকটি বহুল সংস্কার হয় ও দৃশ্য সংখ্যা হয় একুশটি; হাসি, কেদারেশ্বর, অপর্ণার অন্ধপিতা প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্র বর্জিত হয়। প্রধানত 'কাব্যগ্রন্থাবলী'—

সংস্করণকে ভিত্তি করে 'দ্বিতীয় সংস্করণ' প্রকাশিত হল ১ আষাঢ় ১৩০৬ সালে। এতে কাব্যগ্রন্থাবলী-র পঞ্চম অংকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্য মিলিয়ে প্রথম দৃশ্য এবং প্রথম ও চতুর্থ দৃশ্য মিলিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্য গঠিত হয়, শেষ দৃশ্যের সমাপ্তি অংশটি নূতন রচনা। কাব্যগ্রন্থাবলী ও 'দ্বিতীয় সংস্করণ' মিলিয়ে আর একটি সংস্করণ প্রস্তুত হয় কাব্যগ্রন্থ নবমভাগের [১৩১০] অন্তর্ভুক্ত 'বিসর্জন'-এ। ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত 'তৃতীয় সংস্করণ' -এ প্রথম সংস্করণের অনেক অংশ নানা পরিবর্তন সহ গৃহীত হয়, 'হাসি' চরিত্রটির পুনঃ-প্রবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে ১৩৩৮ সালে ১৩১০-এর কাব্যগ্রন্থ সংস্করণটি আবার ফিরে এল—মোটের উপর এই পাঠটিই বর্তমানে প্রচলিত।[১২৭]

'বিসর্জন' 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথম অংশের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ত্রিপুরার রাজমহিষী ছিলেন নিঃসন্তান। সন্তান লাভের জন্য তিনি কালী প্রতিমার কাছে পশু বলি দেওয়ার সংকল্প করেন। এই সংকল্প থেকেই 'বিসর্জন' নাটকে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। ভিখারিনী অপর্ণা রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কাছে অভিযোগ করে যে রাজার অনুচরেরা তার ছাগশিশু ধরে নিয়ে এসেছে বলি দেওয়ার জন্য। অপর্ণা তার ছাগশিশুকে নিজের সন্তানের মত স্নেহ করে। রাজপুরোহিত রঘুপতির পালিত পুত্র এবং কালী মন্দিরের সেবক জয়সিংহ যখন তাকে বলে—

আপনি নিয়েছে
যারে বিশ্বমাতা, তার তরে ক্রন্দন কি
শোভা পায়? (১অ/ ১দৃ:)

এর উত্তরে অপর্ণা তাই বলে—

কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর
শিশু চিনিবে না তারে। মা হারা শাবক
জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি
বেলা করে আসি, খায় না সে তৃণদল,
ডেকে ডেকে চায় পথপানে—কোলে করে
নিয়ে তারে, ভিক্ষা-অন্ন কয়জনে ভাগ
করে খাই। আমি তার মাতা। (ঐ)

জয়সিংহ আবারও যখন বলে 'মা তাহারে নিয়েছেন' তার প্রতিবাদ করে অপর্ণা বলে, 'মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে!' ভিখারিণী বালিকার করুণ আকুতি রাজা গোবিন্দমাণিক্যের অন্তরে আঘাত করে এবং তার অন্তরে করুণার সঞ্চার হয়। একারণেই তিনি রাজ্যে বলি বন্ধ করে দেন। বলি বন্ধ করে দেওয়ার ফলে রাজপুরহিত রঘুপতির সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের বিরোধ শুরু হয়। এ বিরোধকে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "Church ও State-এর বিবাদ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের চিরন্তন কলহ।"[১১৮] আরেক দিকে মন্দির থেকে বলি ফিরিয়ে দেওয়ার কারণে রাণী গুনবতীর সঙ্গেও রাজার বিরোধ দেখা দেয়। রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং যুবরাজ নক্ষত্ররায়কে গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যার জন্য প্ররোচিত করে। সে বোঝায় এ হচ্ছে মাতৃ-আজ্ঞা। কিন্তু জয়সিংহ গুরুর এ আদেশ মাতৃ-আজ্ঞা বলে প্রচার করাকে মেনে নিতে পারে না। এর মধ্য দিয়েই জয়সিংহের অন্তরে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। একদিকে ভিখারিনী অপর্ণার মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে আসার আহ্বান অন্যদিকে গুরুর আদেশ জয়সিংহকে ক্ষতবিক্ষত করে। একসময় জয়সিংহের মনে হয়—

তুমি
সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য—
সত্যপথ তোমারি ইঙ্গিতমুখে। হত্যা
পাপ নহে, ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে, নহে
পাপ রাজহত্যা!— সেই সত্য, সেই সত্য! (২ অ:/৩ দৃ:)

কিন্তু এই জটিল চিন্তাজাল ছিন্ন করে মুক্তির স্বাদ গ্রহণের জন্য পরক্ষণেই আবার বেরিয়ে পড়বার বাসনা জাগে—

কোথা যাও ভাই-সব, মেলা আছে বুঝি
নিশিপুরে? কুকী রমনীর নৃত্য হবে?
আমিও যেতেছি। (ঐ)

গান গেয়ে ওঠে মন—

আমার এই বাধা টুটে নিয়ে যা লুটে পুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে। (ঐ)

আর অপর্ণাকে উদ্দেশ্য করে জয়সিংহ তাই বলে ওঠে—

আয় সখী,

চিরদিন চলে যাই দুইজনে মিলে

সংসারের 'পর দিয়ে, শূন্য নভস্তলে

দুই লঘু মেঘখন্ড-সম। (ঐ)

এই মুক্তি আকাঙ্ক্ষার আত্মমগ্নতা থেকে জয়সিংহ রঘুপতিকে বলে—

তোমারে চিনিনে আমি। আমি চলিয়াছি

আমার অদৃষ্টভরে ভেসে নিজ পথে,

পথের সহস্র লোক যেমন চলেছে।

তুমি কি বলিছ মোরে দাঁড়াইতে? তুমি

চলে যাও—আমি চলে যাই। (ঐ)

কিন্তু কিছু পরেই জয়সিংহকে পুনরায় বলতে হয়—

প্রভু! পিতা! গুরুদেব!

কী বলিতেছিনু! স্বপ্নে ছিনু এতক্ষণ। (ঐ)

জয়সিংহের এই দ্বন্দ্বময়তায় একদিকে গুরুদেবসম পালিত পিতা রঘুপতি এবং তার মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ অন্যদিকে মুক্তিপথের দিশারী অপর্ণা। অপর্ণা যখন জয়সিংহকে আহ্বান জানিয়েছে এই বলে, 'তুমি চলে এসো জয়সিংহ, এমন্দির ছেড়ে/ দুইজনে চলে যাই।' কিন্তু জয়সিংহ মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। বলে, 'বন্দী আমি সত্য-কারাগারে'। জয়সিংহের কাছে মন্দির ছেড়ে চলে যাওয়াটা সত্য নয়, সত্য হচ্ছে মন্দিরে থেকে গুরুর আদেশ পালন করা। তাই নক্ষত্ররায় যখন গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করতে পারে না তখন রঘুপতি জয়সিংহকেই আদেশ করে গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করার জন্য। জয়সিংহ প্রতিজ্ঞা করে—

আমি এনে দিব রাজরক্ত, শ্রাবণের

শেষ রাত্রে দেবীর চরণে। (২ অ:/৪ দৃ:)

জয়সিংহ গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করতে পারেনি। শ্রাবণের শেষ রাত্রে নিজেই আত্মঘাতি হয়েছে প্রতিমার সামনে। গুরুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে রাজরক্ত নিয়ে আসবে সেই প্রতিজ্ঞাই সে পালন করে—

রাজরক্ত

চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী

মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না

তৃষা? আমি রাজপুত, পূর্বপিতামহ

ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর

মাতামহবংশ—রাজরক্ত আছে দেহে।

এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত

হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন

অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুর। (৫ম অ:/১ম দৃ:)

একে মৃত্যু না বলে জয়সিংহের আত্ম-বিসর্জন বললেই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করি। রঘুপতির সমস্ত ধরনের কর্মকান্ডকেই জয়সিংহের কাছে অন্যায় এবং অসত্য মনে হয়েছে কিন্তু তবুও সে রঘুপতির আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি। অপর্ণা তাকে যে আহ্বান জানিয়েছিল সে আহ্বানে সে সাড়া দিতে পারে নি কিন্তু অন্তরে ছিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। আর এই মুক্তির পথ হিসেবে সে বেছে নিল আত্ম-বিসর্জন। এই আত্ম-বিসর্জনের মধ্যদিয়ে বিসর্জিত হল মিথ্যা বিশ্বাস। রঘুপতির দীর্ঘদিনের অন্ধ বিশ্বাসের সৌধ জয়সিংহের মৃত্যুর মুহূর্তেই ভেঙ্গে গেল। রঘুপতির অন্ধকার অন্তরে আলোর প্রবেশ ঘটলো জয়সিংহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। পুত্রসম এই শিষ্যের মৃত্যুর আঘাতেই রঘুপতির ঘটলো উত্তরণ। এই উত্তরণ অমানবিকতা থেকে মানবিকতায়, মিথ্যা থেকে সত্যে। এতদিন যে অপর্ণাকে অবহেলা করেছিল এই উত্তরণের কারণেই রঘুপতি তাকেই 'আয় মা অমৃতময়ী' বলে সম্বোধন করলো। আর অপর্ণাও রঘুপতিকে আহ্বান জানালো 'পিতা, এসো এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা'। অপর্ণা গোড়াতেই বুঝেছিল এই মন্দিরকে ঘিরেই মিথ্যা বিশ্বাস এবং অমানবিকতার অন্ধকার জমাট বেঁধেছে সুতরাং এখান থেকে মুক্তি প্রয়োজন। রঘুপতির অন্ধ বিশ্বাস চূর্ণ হওয়ার পরেই মনে হয়েছে দেবী কোথাও নেই। কারণ যে দেবীকে তুষ্ট করার জন্য এত হত্যা, এত রক্ত, এত ষড়যন্ত্র সেই দেবীই তার সবচেয়ে আপনার জনকে কেড়ে নিল। তাই বিশ্বাস গেল ভেঙ্গে। দেবীকে মনে হল 'জড়/ পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো।/ মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির'। এ কারণেই সে কালী প্রতীমাকে নিক্ষেপ করে নদীর জলে। রানী গুণবতী যখন মন্দিরে পূজা দিতে এসে দেখে মন্দিরে দেবী নেই তখন রঘুপতিকে জিজ্ঞেস করে 'দেবী কই'? তার উত্তরে রঘুপতি দৃঢ় ভাবে বলে—

কোথাও সে

নাই। ঊর্দ্ধে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে

নাই, কোথাও সে ছিলনা কখনো। (৫ অ:/৪ দৃ:)

রঘুপতির এই কথা বিশ্বাস করে গুণবতী এবং তারও অন্তরে পরিবর্তন ঘটে। অন্তরের পরিবর্তনের কারণেই এত দিনের দ্বন্দ্ব ভুলে মিলন হয় রাজার সঙ্গে এবং রাজাকে উদ্দেশ্য করে গুণবতী বলে ওঠে—

আজদেবী নাই-

তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা। (ঐ)

'বিসর্জন' বন্ধন মুক্তির নাটক। গোবিন্দমাণিক্য, গুণবতী, রঘুপতি সকলেরই বন্ধন-মুক্তি ঘটে। আত্ম-বিসর্জনের মধ্য দিয়ে জয়সিংহরও বন্ধন-মুক্তি ঘটে। 'বিসর্জন' একদিকে যেমন জয়সিংহের আত্ম-বিসর্জন তেমনি অন্যদিকে মিথ্যা বিশ্বাস বিসর্জনও বটে।

'বিসর্জন'-এ 'পথ' দৃশ্যপট হিসেবে দেখা দিয়েছে একবার। ২য় অংকের ৩য় দৃশ্যটি 'মন্দির-সম্মুখে পথ'। জয়সিংহ বসে আছে। মানুষজন পথ দিয়ে চলেছে মেলার দিকে। পথের এই দৃশ্যরূপ তার অন্তরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়। তারও ইচ্ছে জাগে মন্দিরের এই অবরুদ্ধতা থেকে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আনন্দ করতে, নিজেকে বিলিয়ে দিতে সকলের মাঝে। একারণেই জয়সিংহ গেয়ে ওঠে, ''আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে।'' এই আত্ম-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকেই অপর্ণাকে সঙ্গী করে সংসার থেকে চিরদিনের জন্য ভারহীন মেঘের মত বেরিয়ে পড়ার বাসনা দেখা দেয়। আকাঙ্ক্ষার এই আত্মমগ্নতায় রঘুপতিকে তার মনে হয় অপরিচিত —

তোমারে চিনিনে আমি। আমি চলিয়াছি
আমার অদৃষ্টভরে ভেসে নিজ পথে,
পথের সহস্র লোক যেমন চলেছে।

দেবী অথবা মন্দির প্রাঙ্গন ছেড়ে সংসারের রাজপথই তারকাছে মুক্তির নিশানা মনে হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত জয়সিংহ মুক্ত হতে পারে না, তার মুক্তি আসে অনেক পরে অন্যভাবে। তবুও পথের চলমান দৃশ্যপটকে সামনে রেখে জয়সিংহের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এই পথকে প্রতীকী মাত্রায় উজ্জ্বল করে তোলে। পথ হয়ে ওঠে মুক্তির প্রতীক, যা পরিণত রবীন্দ্রনাট্যের অনন্য সংযোজন।

'বিসর্জন'-এ সাধারণ জনতার উপস্থিতি রয়েছে তিনটি দৃশ্যে। ১ম অঙ্কের ৫ম দৃশ্য, ২য় অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্য এবং ৩য় অঙ্কের ১ম দৃশ্যে জনতার উপস্থিতি রয়েছে। এইসব দৃশ্যের সাধারণ জনতা রবীন্দ্রনাট্যের বিশিষ্ট জনতা। যারা অশিক্ষিত এবং নির্বুদ্ধিতাই যাদের বৈশিষ্ট্য। একারণেই রঘুপতি যখন প্রতিমার মুখ

পিছনে ফিরিয়ে দিয়ে বলে যে দেবী বিমুখ হয়েছে তখন তারা তাই বিশ্বাস করে আবার যখন অপর্ণা সেই ফেরানো মুখকে সামনে ঘুরিয়ে দেয় তখন তারা বিশ্বাস করে যে দেবী পুনরায় সদয় হয়েছে। নিজেদের বিচার বুদ্ধি বলে তারা কোন কিছুই নির্ধারণ করতে পারে না।

নির্দেশিকা

১. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯০। পৃ: ১০১।

২. ঐ, পৃ: ১৪।

৩. ঐ, পৃ: ৯৯।

৪. মহলানবিশ, প্রশান্তচন্দ্র, 'রবীন্দ্রপরিচয়', *প্রবাসী*, শ্রাবণ ১৩২৯।

৫. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* - ১ম খন্ড, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৯২। বিশ্বভারতী। পৃ: ১০৭।

৬. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* - ৩য় খন্ড, মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৩৫৩, পৃ: ৪১।

৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* - ১ম খন্ড। পৃ: ১০৭ - ৮।

৮. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড। পৃ: ১০২।

৯. ঐ।

১০. সিকদার, অশ্রুকুমার, *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য*, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৩। পৃ: ২০০।

১১. ঐ।

১২. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* - ৩য় খন্ড। পৃ: ৪৭।

১৩. '' 'নাটিকা' ছাপ সত্ত্বেও 'রুদ্রচন্ড' গাথা-কাব্যেরই সগোত্র, এবং ইহাই রবীন্দ্রনাথের শেষ গাথাকাব্য।''—সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* - ৩য় খন্ড। পৃ: ৪৭।

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০১, বিশ্বভারতী। পৃ: ১০৮।

১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, ভগ্নহৃদয়। *রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ*-১ম খন্ড। বিশ্বভারতী।

১৬. সমাদ্দার, শেখর, *নাট্যমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ*, প্যাপিরাস, জানুয়ারি ১৯৯৮। কোলকাতা। পৃ: ১৩-১৪।

১৭. গ্রন্থপরিচয়, *রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ* - ১ম খন্ড।

১৮. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ', *বঙ্কিম মৃত্যুবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ*, সম্পাদক অশোক কুন্ডু। দি নিউ বুক ষ্টল, কলকাতা। ৯ মে ১৯৯৪।

১৯. গ্রন্থপরিচয়, *রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ* - ১ম খন্ড।

২০. সিকদার, অশ্রুকুমার, 'খেদের গান', *রাতের তারা দিনের রবি*, সম্পাদনা উজ্জলকুমার মজুমদার। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৯৫। পৃ: ৯০।

২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১০৮।

২২. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড।পৃ: ১৪।

২৩. ঐ, পৃ: ৫৪।

২৪. ঐ।

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১০৮।

২৬. বিশী, প্রমথনাথ, 'ভগ্নহৃদয়', *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা। বৈশাখ - আষাঢ়, ১৩৫১।

২৭. *রবীন্দ্ররচনাবলী* - ৩০ খন্ড। বিশ্বভারতী।

২৮. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* - ১ম খন্ড। পৃ: ১১৩।

২৯. ঐ।

৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১০৮।

৩১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভগ্নহৃদয়-এর ভূমিকা। *রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ*-১ম খন্ড।

৩২. ঐ।

৩৩. ঐ।

৩৪. বিশী, প্রমথনাথ, 'ভগ্নহৃদয়', *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা। বৈশাখ - আষাঢ়, ১৩৫১।

৩৫. সিকদার, অশ্রুকুমার, *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য*। পৃ: ৪৩।

৩৬. গুপ্ত, ড: সুশীলকুমার, *রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গ: কাব্যনাটক*, প্রকাশকাল ১৩৬৮। পৃ: ৩১।

৩৭. চৌধুরী, শ্রীভূদেব, *বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের ইতিকথা* (প্রথম পর্ব), ['বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'-তৃতীয় পর্যায়], প্রথম প্রকাশ: আষাঢ়, ১৮৯২ শকাব্দ। পৃ: ৬৭।

৩৮. ঐ, পৃ: ৬৮।

৩৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *যোগাযোগ*।

৪০. *বান্ধব*, কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত। আষাঢ় ১২৮৮ (১৮৮১)। পৃ: ১৪৩।

৪১. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, 'রবীন্দ্রনাটকের ধারা' (একটি ঐতিহাসিক আলোচনা), *শনিবারের চিঠি*, বৈশাখ ১৩৬৭।

৪২. শেঠ, জীবনকৃষ্ণ, *রবীন্দ্রনাটক প্রসঙ্গ*, প্রথম সংস্করণ, পৌষ ১৩৬৩। পৃ: ১১।

৪৩. গুপ্ত, ড: সুশীলকুমার, *রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গ: কাব্যনাটক*, প্রকাশকাল ১৩৬৮। পৃ: ৪৪।

৪৪. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড।পৃ: ১০২।

৪৫. শেঠ, জীবনকৃষ্ণ, *রবীন্দ্রনাটক প্রসঙ্গ*। পৃ: ১১।

৪৬. Thompson Edward, *Rabindranath Tagore Poet and Dramatist*, Second Edition, 1948, London. p. 30.

৪৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সংঘমিত্রা, *রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব*, প্রথম প্রকাশ ১৫ এপ্রিল ১৯৭৮, কলকাতা। পৃ: ২৩১- ৩২।

৪৮. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ২য় খন্ড। পৃ: ৮৫।

৪৯. ঐ, পৃ: ৮৩।

৫০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতির প্রথম পান্ডুলিপি, *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন ১৩, শ্রাবণ ১৩৯২। বিশ্বভারতী, পৃ: ৩৯।

৫১. রায়, শ্রীবার্ণিক, 'রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, *গীতবিতান পত্রিকা*, রবীন্দ্রজন্ম শত বার্ষিকী, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮। পৃ: ৯৮।

৫২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বিহারীলাল', *আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী*- নবমখন্ড। বিশ্বভারতী। পৃ: ৪২১।

৫৩. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপদ, *রবীন্দ্রচর্যা*, জেনারেল ১৯৭৩। পৃ: ১১৭-১৮।

৫৪ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সূচনা, *বাল্মীকি প্রতিভা, রবীন্দ্র-রচনাবলী*- প্রথম খন্ড। বিশ্বভারতী।

৫৫. রায়, নীহাররঞ্জন, *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৯। কলকাতা। পৃ: ২৫৩।

৫৬. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপদ, *রবীন্দ্রচর্যা*, জেনারেল১৯৭৩। পৃ: ১১৯।

৫৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১১৬।

৫৮. Thompson Edward,*Rabindranath Tagore Poet and Dramatist*, Rddhi edition 1979. p. 32.

৫৯. গ্রন্থপরিচয় অংশ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*-১৭শ খন্ড, বিশ্বভারতী, পৃ: ৪৭২।

৬০. সেন, ড: সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* - ৩য় খন্ড। পৃ: ২৪৭।

৬১. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ২য় খন্ড। পৃ: ৮৩।

৬২. চক্রবর্তী, সুধীর, 'গানের দুই রাজা: রবীন্দ্রনাথ ও রবার্ট বার্নস', *গানের লীলার সেই কিনারে*, ১৩৯২। পৃ: ৪২। —আমরা এই উদ্ধৃতিটি সংগ্রহ করেছি প্রশান্তকুমার পালের রবিজীবনী- ২য় খন্ড থেকে। পৃ: ৮৩।

৬৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতির প্রথম পাণ্ডুলিপি, *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন - ১৩,শ্রাবণ ১৩৯২। বিশ্বভারতী। পৃ: ৩৯।

৬৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বিহারীলাল', *আধুনিক সাহিত্য*, রবীন্দ্ররচনাবলী - নবম খন্ড, বিশ্বভারতী। পৃ: ৪৩২।

৬৫. ঐ।

৬৬. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ২য় খন্ড। পৃ: ৮০।

৬৭. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপদ, *রবীন্দ্র-চর্যা*। পৃ: ১২২।

৬৮. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* - ১ম খন্ড। পৃ: ১০১।

৬৯. ঐ।

৭০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১১৭।

৭১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা', *সংগীত চিন্তা*, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯। বিশ্বভারতী। পৃ: ২৭৪।

৭২. বসু, সৌমিত্র, *রবীন্দ্রনাটকের নির্মাণ শৈলী: উনিশ শতক*, প্রথম প্রকাশ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৩। কলকাতা, পৃ: ৮৩।

৭৩. রায়, বার্ণিক, *রবীন্দ্রনাটকের উৎস*, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭ ডিসেম্বর, কলকাতা। পৃ: ২১।

৭৪. সিকদার, অশ্রুকুমার, 'রবীন্দ্রমঞ্চ ও নাট্যাদর্শ,' *বাক্যের সৃষ্টি: রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮১। কলকাতা। পৃ: ১২৩।

৭৫. দাস, পুলিন, *মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ ২৫ শে বৈশাখ, ১৩৯৮। কলকাতা, পৃ: ৬।

৭৬. ভট্টাচার্য, ড: গৌরীশঙ্কর, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, প্রথম প্রকাশ ১লা অক্টোবর, ১৯৭২, কলকাতা। পৃ: ৬১১।

৭৭. ঐ।

৭৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি* । পৃ: ১১৬।

৭৯. J. Dent, Edward, *Opera*, Penguin 1949, P. 16-17.

৮০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি* । পৃ: ১১৭।

৮১. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ২য় খন্ড। পৃ: ১৫৭।

৮২. ঐ, পৃ: ১৫৮।

৮৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১১৭।

৮৪. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ২য় খন্ড। পৃ: ১৫৮।

৮৫. রায়, শ্রীবার্ণিক, 'রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য', *গীতবিতান পত্রিকা*, ২৫ শে বৈশাখ ১৩৬৮। পৃ: ১০১-২।

৮৬. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, / চন্দ, শ্রীমতী রাণী, *ঘরোয়া*, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৯৮। বিশ্বভারতী। পৃ: ৯৯।

৮৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* - ১ম খন্ড। পৃ: ১৬৯।

৮৮. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* - ৪র্থ খন্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৬। পৃ: ১৯২।

৮৯. ঐ, পৃ: ১৯৪ - ৯৫।

৯০. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ২য় খন্ড। পৃ: ২০৮।

৯১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৪১।

৯২. ঐ, পৃ: ১৪২।

৯৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সূচনা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, *রবীন্দ্ররচনাবলী* - ১ম খন্ড। বিশ্বভারতী।

৯৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৪১।

৯৫. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* - ৪র্থ খন্ড। পৃ: ১৯৩ - ৯৪।

৯৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৪১ - ৪২।

৯৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *আত্মপরিচয়*, সংস্করণ ১৪০০। বিশ্বভারতী। পৃ: ২১।

৯৮. ঐ, পৃ: ২৫।

৯৯. ঐ, পৃ: ২৬।

১০০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সীমার সার্থকতা', *পথের সঞ্চয়*, *রবীন্দ্ররচনাবলী* ষড়্বিংশ খন্ড, বিশ্বভারতী। পৃ: ৫৬০ - ৬১।

১০১. *চিঠিপত্র* - ৮, বিশ্বভারতী। পৃ: ৪৫- ৪৬।

১০২. ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, *আত্মজীবনী*, সম্পাদনা অরবিন্দ মিত্র, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬২। পৃ: ১১৭।

১০৩. ঐ, পৃ: ১৫৮।

১০৪. ঐ, পৃ: ১৫৯।

১০৫. আইয়ুব, আবু সয়ীদ, *পথের শেষ কোথায়*, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ অক্টোবর ১৯৯২। পৃ: ১০৬।

১০৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৪১।

১০৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৪২।

১০৮. চৌধুরী, শ্রীভূদেব, 'রবীন্দ্রনাথ ও সাংকেতিক নাটক'। *রবীন্দ্রভাবনা*, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৬। পৃ: ৮।

১০৯. ঘোষ, শঙ্খ, *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৫। পৃ: ৬১।

১১০. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা*, ওরিয়েন্ট বুক কম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬১। পৃ: ২১৮।

১১১. বিশী, শ্রীপ্রমথনাথ, *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ*, প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ ১৫ই আগস্ট, ১৯৬৬। পৃ: ৪৮৫ - ৮৬।

১১২. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড।পৃ: ২০৯।

১১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মায়ার খেলা' নাটকের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন। *রবীন্দ্ররচনাবলী* - ১ম খন্ড। বিশ্বভারতী।

১১৪. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* - ১ম খন্ড। পৃ: ১৯৩।

১১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মায়ার খেলা' নাটকের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন। *রবীন্দ্ররচনাবলী*-১ম খন্ড। বিশ্বভারতী।

১১৬. চৌধুরাণী, ইন্দিরা দেবী, *রবীন্দ্রস্মৃতি*, পুনরমুদ্রণ বৈশাখ ১৩৯৬। বিশ্বভারতী। পৃ: ৩৩।

১১৭. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ৩য় খন্ড, প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কোলকাতা। পৃ: ১০৫।

১১৮. ঐ, পৃ: ৭৬।

১১৯. 'মায়ার খেলা' নাটকের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, *রবীন্দ্ররচনাবলী* - ১ম খন্ড। বিশ্বভারতী।

১২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সূচনা, *বাল্মীকি প্রতিভা*। *রবীন্দ্ররচনাবলী* - ১ম খন্ড। বিশ্বভারতী।

১২১. দাস, পুলিন , *মঞ্চঅভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ* । পৃ: ১১

১২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১১৭।

১২৩. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ৩য় খন্ড। পৃ: ১২১।

১২৪. ঐ, পৃ: ১০৮।

১২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সূচনা, *রাজা ও রানী*, *রবীন্দ্ররচনাবলী* - প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী।

১২৬. বিশী, প্রমথনাথ, *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ* - ২য় খন্ড। প্রথম ওরিয়েন্ট সংস্করণ - সেপ্টেম্বর ১৯৫৮। কোলকাতা। পৃ: ১৭।

১২৭ পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ৩য় খন্ড । পৃ: ১৩২ - ৩৩।

১২৮. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* - ১ম খন্ড । পৃ: ২৮৫।